মধুপ

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা-বুক্-ডিপো লিমিটেড
২০৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয় বন্ধু

শ্রীনরেন্দ্র দেবের

সু-করকমলে

কাশী

রথযাত্রা

আষাঢ় ১৩৩৫

—আন্তরিকতার আবেষ্টনকে অস্বীকার ক'রে, প্রাণের বাঁধনকে প্রাণ পণে এড়িয়ে লঘু চিত্ত মধুপ ফুলের পর ফুলের বুকে মনের সুখে মধু লুটে উড়ে বেড়ায়। ফাগুণের দখিন হাওয়ার মতো হাল্‌কা দু'খানি পাখা নেড়ে দু'দিনের জন্য তার আসা যাওয়া!—আর বসন্ত......
ঠিক সেই রকম করেই সেও আসে বনকে জাগিয়ে; মনকে মাতিয়ে!

—সে কোন অজ্ঞাত দেশের কোন সে অনাগত শিকারের আশায় তরুণী ফুলদল তাদের নিজের বুকের সৌন্দর্য্য উথলে দিয়ে ব'সে থাকে যেন শীকারীর মতোই ফাঁদ পেতে—কী যে ধরতে হবে সেটা কিন্তু একেবারে না জেনেই।

—মধু-পান-পীপাসু পতঙ্গ গুঞ্জন ক'রে এসে তার বুকের উপর পড়ে। মধু লোভে কত না কৌশলে তার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করে। কোন অনাস্বাদিত আনন্দের সন্ধান তাকে দিয়ে মত্ত-মধুপ কুসুম-চিত্ত বিহ্বল করে তোলে।

—দেশান্তরে এসে একদা সে তার চির-অভ্যাস মতো বেলাশেষের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের সে আপনাকে উজাড় করে দেওয়া মধু নিঃশেষে পান ক'রে আর পালাবার পথ খুঁজে পায়না! তার মধু মত্ত চেতনার অজ্ঞাতে ফুলের কোমল পাপড়িগুলি কখন যে ধীরে ধীরে তাকে জড়িয়ে ধ'রে আপন মর্ম্ম-পুরে বন্দী ক'রে ফেলে সে তার আভাসটুকু মরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জানতে পারে না!

—মধুপ!

কালোর কথা

১

আমি কালো! আমার নামও হয়েছে ঐ কালো! একটু খানি বয়েস থেকেই শুনে আস্‌ছি,—সকলেই বলে যায় মেয়েটা কালো! মাকেও বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছি,—এই আমাকে নিয়েই! আমার দেহের এই কালো আবরণের জন্যে বাবাকে কত ব্যথাই না সহ্য করতে হয়েছে, ঘরে ও বাইরে।

বাবা আমায় বরণ করে নিয়েছিলেন, ভগবানের পূত আশীর্ব্বাদী ফুলটির মতো। তাঁর সমস্ত স্নেহটুকুর

দাবীদার হয়ে বসেছিলুম—একা আমিই! শুধু তিনিই আমার এই কালো হওয়ার দুঃখকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর অতিরিক্ত স্নেহ-মমতায়-গড়া হৃদয়খানা দিয়ে।

আমারই ছোট বোন আলো—সুন্দরী। তার দিকে প্রায়ই চেয়ে দেখতুম, ভাবতে পারতুম না—কেন সে সুন্দরী। তার ত আমার চেয়ে কিছুই বেশী নেই। আলোর দেহের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে তুলনা করেছি—কই, বুঝতে ত পাচ্ছি না।

কিন্তু বুঝেছি, সে তার অনেক পরে। বয়স তখন আমার পোনেরো কি ষোলো। আমার বিবাহের চিন্তায় বাবার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দেহখানি আরও শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগল। বেদনায় বুকের ভাবনা মুখের উপর এসে জড় হ'ল। অবশেষে সকল ভাবনার চরম হ'ল সে দিন—যে দিন কোনো কিছুই আর তাঁর মর-দেহকে সাড়া দিতে পারলে না। আমার বিয়ের জন্যই বুঝি তিনি ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়্‌তে চলে গেলেন। কিন্তু তাতেও ত আমার বিয়ের কোনই সুবিধা হয়ে উঠ্‌লো না। বরং মা সে অবস্থায় আমায় নিয়ে পড়লেন আরও এক ভীষণ বিপদে। কেন না আমি কালো।

কালোর কথা

আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে, হাতখানা দোলা দিয়ে, মুখখানা ঘুরিয়ে, খোঁপাটা কতবার করে খুলে,—বিউনীর ডগাটি দাঁতের আগায় চেপে, মুচ্‌কে হেসে, চোক্ ঘুরিয়ে অনেক করে দেখেছি—কিন্তু দেহের ওই কালো রঙ্‌ই আমার অঙ্গের প্রত্যেক ভঙ্গিমার সঙ্গে মিশে প্রতি পদে আমার বাদ সেধেছে। কিন্তু এই কালো রঙ্‌টাকেও এক দিন পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হ'ল—হয়ত অল্প সময়ের জন্য।

নতুন বসন্তের কচি পাতার মত আমার দেহে যৌবনের প্রভাব এসে পড়ল। এই কালো রংয়ের ওপরেও গালের টোলে, চখের কোলে ফুটে উঠ্‌ল, দীপ্ত তারুণ্যের টাটুকা আভা। বর্ষাপ্লাবিত নদীর মত বুকখানির দু'কূল ভরে উঠল, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বসিত স্রোতে। কিশোরীর অনবগুণ্ঠিত চাঞ্চল্য যুবতীর রক্তিম লজ্জার বাসে ঢাকা পড়ল।

২

তরলের সঙ্গে আলাপের দিনটি আজও মনে পড়ে! তখনও সন্ধ্যা হয় নি—আষাঢ়ের বর্ষোণোন্মুখ আকাশখানা ম্লান মুখ করে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল, অভিমানী মেয়েটির মতো! একখানা বই পড়ছিলুম। পাশের ঘর থেকে মা ডেকে বললেন—কালো, দু'টো পান সেজে নিয়ে আয় ত মা। কৌতুহল হ'লো। বইখানি মুড়ে পাশের ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌লুম, একটি অতি সুন্দর তরুণ যুবা মার সঙ্গে কথা কইছে! আলো একধারে বসে

তাঁদের কথা শুনছে কি যুবকের সুন্দর মুখখানি দেখ্‌ছে, এ কথা ঠিক বলতে পাচ্ছি না। তবে এটা সহজেই লক্ষ্য করলুম যে প্রতিক্ষণেই যেন যুবকের চোখ দুটি তার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে।

মার কাছে পানের ডিবেটি রেখে যেমন ফিরে যাচ্ছি, মা বলে উঠলেন, ব'স, ত' মা কালো! এটি বাবা আমার বড় মেয়ে। রংটা একটু কাল বটে, কিন্তু এমন শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে—নিজের মেয়ে বলে বলছিনে বাবা।

দোকানী যেমন ক্রেতার কাছে নিজের জিনিষটির পরিচয়ে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে আমার মা—যে তার চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন হন নি, সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়েছিল। লজ্জায় ও ধিক্কারে সমস্ত অন্তরটা একেবারে ছি ছি করে উঠলো—শুধু নিজের জন্য নয় —এই সমস্ত মেয়ে জাতটাই যে আজ পুরুষদের কাছে পণ্যের সামিল—এই কথাটা ভেবে!

একটু পরে নিজেকে সংযত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। যাবার সময় এটা বেশ চোখে পড়ল যে যুবক আমার যাবার গতির ভঙ্গীটুকুর দিকে চেয়ে আছে! জানি না তার চোখে তখন কি ভাব ফুটে উঠেছিল! সেদিনের সেই কাছে বসার লজ্জাটুকুই যদি চরম হত,

হয়ত জীবনে আরও লজ্জা, পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তারই প্রসাদ-প্রার্থী হওয়ার হীনতা—এ সব ভোগবার অবসর পেতুম না!

সেইদিন রাতে শয্যায় আমি আলোকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও কে ভাই।

আলো আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট—কাজেই আমাদের মধ্যে ভগ্নী-সম্বন্ধের চেয়ে সখীত্বের দাবীই হয়ে পড়েছিল, অনেকখানি! আমার পিঠে একটি ছোট কিল মেরে আলো বল্লে,—কে ভাই!

জিজ্ঞাসা করবার সাহস যে আমার নাই, অথচ সেই দুর্ব্বলতাটুকুও আলোর কাছে ধরা দিতে রাজী ছিলুম না ব'লে জোর করে বল্লুম,—ওই যে সন্ধ্যেবেলা—

ওঃ, তরল বাবু, যাকে তুমি পান দিয়ে গেলে ত? নিতান্ত সহজ-স্বরে আলো বল্লে,—উনি মার কোন এক বন্ধুর ছেলে, কাশীতে থাক্‌তেন, কলকাতায় এসেছেন।

আরো কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠছিলুম কিন্তু আলোর কাছে সে ভাব গোপন করে ঔদাস্য দেখিয়ে বললুম,—ওঃ!

আলো হঠাৎ বললে—আচ্ছা ভাই, তরল বাবু বেশ সুন্দর—না?

তাকে ছোট একটা ঠেলা দিয়ে বল্লুম,—সে কথা আমার চেয়ে তুই ভালো বলতে পারিস! মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলি ত' অনেকক্ষণ!

খিল খিল করে হেসে আলো বল্লে,—আমার দিদির বরটিকে দেখে নিতে হবে ত!

দূর পোড়ারমুখী! পাশ ফিরে শুয়ে রইলুম! দুরাশার স্বপ্ন এসে অন্তরের গোপন তারগুলিতে আনন্দের সাহানা সুর বাজাতে লাগল!

দু'দিন চলে গেল। এ দু'দিনের মধ্যে রোজই অপরাহ্নে এই কালো চামড়াটাকে উজ্জ্বল করবার বৃথা আশায় সাবান ঘসেছি! খয়ের রংয়ের যে সাড়ীখানা মা পূজোর সময় কিনে দিয়েছিলেন, যেন আমার অজ্ঞাতেই কিসের সাধে সেখানা আমাকে সোহাগে জড়িয়ে ফেলেছিল। কবে কোন্ বন্ধুর উপহার দেওয়া—তরল-আলতা, সুগন্ধি তেল, আতরের শিশি প্রসাধনের এই যে সব ছোটখাট জিনিষগুলি এতদিন যা নিজের ছোট পেটিকাটির মধ্যে সযত্নে বন্ধ ছিল, আজ সেগুলি সমস্ত আমারই দরকারে যেন উন্মুখ হয়ে পড়ল।

এই যে দু'দিন ধরে নিজেকে সাজিয়ে তোলবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, আমার সমস্ত অন্তরটাকে আচ্ছন্ন

করে ফেলেছিল, নিজেকে তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করে, সেই জিনিষটার স্বরূপ ধরা পড়তেই,—নিজের কাছে নিজেই যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লুম! আলোর কাছে নিজেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি! তার রহস্যের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ হৃদয়কে বিদ্ধ করলেও—রাগতে পর্য্যন্ত পারি নি। সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম্মে সাজ-সজ্জাগুলো এলোমেলো হয়ে পড়লেই, অকারণ চোখ দুটো জলে ভরে যেত!

বইখানি হাতে ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল জানালার বাইরে, বসুমতী চুম্‌কী দেওয়া যে নীল ওড়নাখানা মাথায় চাপা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল—সেই দিকে! আলো ঘরে ঢুকেই আমার হাতখানায় জোরে একটা টান দিয়ে বল্লে—চল না দিদি, ও ঘরে একবার।

আমার আপত্তির অল্পই সুযোগ দিয়ে একেবারে দরজার কাছে এনে ছেড়ে দিলে। মা ভেতর থেকে ডাকলেন,—আয় না মা কালো, এখানে এসে বোস্‌না একটু! সরম-কুণ্ঠিতা লতাটির মতোই ধীরে গিয়ে মার পাশে বসলুম। চোখ্‌ তুলে কোন দিকে চাইবার সাহস আমার হয় নি!

তরলকুমার অতি সহজস্বরে বল্লে—মাসি মা, আজ

বুঝি পান টান আর পাচ্ছি না। সেদিন দেখলেন ত আমি পান খেতে কত ভালবাসি! জামার পকেট থেকে একটি সুন্দর পানের ডিবে বার করে সে বলে যেতে লাগলো,—বুঝলেন, রোজ এই ডিবের পাঁচ, ছ' কৌটো পান আমার বরাদ্দ।

মার আদেশ পাবার পূর্ব্বেই ঘরে গিয়ে ছ'টি পান সেজে এনে মার কাছে দিলুম! মা হেসে বল্লেন,—তুই নিজেই দে না মা, তরলকে লজ্জার কিছু নেই! তোরা কি জানবি, ওর মা আর আমি ভিন্ন ছিলুম না! মা চট্ করে আঁচলের কোনটি চোখে চাপা দিয়ে রগড়াতে লাগলেন!

পানের ডিবেটি তার কাছে রেখে, মার কাছে এসে বসলুম। পানছুটি মুখে পুরে আমার দিকে তাকিয়ে সে বল্লে—একটু চুণ দিতে হবে যে। আর সেদিনের সেই ভাজা দোক্তা, সেই দোক্তা একটুখানি।

আবার উঠে গিয়ে তার প্রার্থিত জিনিষছুটি এনে সামনে রাখলুম। তার এই তুচ্ছ আদেশটিতে আমার অন্তঃকরণের ভেতরটা যেন কৃতার্থতায় ভরে গেল! হৃদয়-কমল আনন্দের আবেগে শতদলে বিকশিত হ'তে লাগল। আমি তার প্রত্যেক পাপ্ড়িটির শিহরণ যেন সমস্ত দেহ-মনে অনুভব করতে লাগলুম।

আলোর সঙ্গে তরলের কত না কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। আমারও ইচ্ছে হ'তে লাগল যে ওই রকম সঙ্কোচ-হীন হয়ে আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিই কিন্তু পারার সে শক্তি যে আমার ছিল না। অক্ষমতার অনুতাপ কেবল একটা ঈর্ষ্যার ক্লীব-আগুন মনের মধ্যে ধুঁইয়ে তুলে—ওই নির্লজ্জা মেয়েটাকে তার চখের আড়ালে ঢেকে রেখে দিতে চাইছিল।

অনেকটা রাত হয়ে গেল, মা বললেন—এখানেই বাবা, দু'টো ক্ষুদ কুঁড়ো মুখে দিয়ে গেলে হত না?

তরল বল্লে—তার জন্য মাসীমা আপনাকে ত বলতে হবে না। তবে আজ আর নয়।

আলো আবদারের সুরে বল্লে,—না তরলবাবু, কোন কথাই শুনছি নি। খেয়ে আজ এখানে যেতেই হবে।

আলো যে ভঙ্গীতে কথাগুলি বল্লে তা কেবল খুব নিকটতম ও প্রীতির সম্পর্ক বিশিষ্ট আত্মীয়কেই বলা মানায়! কি বেহায়া মাগো!

তরলকুমার হেসে বল্লে, তোমার দিদির মত নেই কিন্তু! থাক্‌লে নিশ্চয় বলতেন!

অগত্যা মুখ ফুটে কোন প্রকারে বল্লুম—এখানেই আজ খেয়ে যেতে হবে।

লজ্জায় কাণ দুটো কেমন করে উঠলো!

হাসতে হাসতে তরলকুমার বল্লে—মাসীমা, যখন ওদের দুজনেরই মত হয়েছে, তখন কাল আপনাদের কাছে, আমার নিমন্ত্রণ, মনে থাকে যেন!

তরল বিদায় নিলে।

মা তাকে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—দেখো বাবা, —ভুলো না কিন্তু!

৩

আজ আর সে সঙ্কোচ, সে সরম, সে কুণ্ঠা নাই। মা পাশের বাড়ী বেড়াতে গেছেন, আলো নিচেয় গা ধুচ্ছে, এমনি অবস্থায়ও তরল ও আমি বসে গল্প কচ্ছি। সে দিন আমি আলোকে নির্লজ্জা ভেবে কত না গাল দিয়েছিলুম, আজ নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবলুম, আমিও তার চেয়ে কিসে কম।

সময়ে অসময়ে তরল আসত। হয়ত ছাদে চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়িয়ে বসে আছি, তরল মৃদু হেসে সামনে

এসে দাঁড়াল। শ্লথ-বসনে নিশ্চিন্ত মনে দুপুরে শয্যায় শুয়ে বই পড়ছি, তরল ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বইখানি কেড়ে নিলে। বিরক্ত হবার, রাগ করবার অবকাশটুকু পর্য্যন্ত দিত না, এমন মোহন গল্পের জাল সে বুনে তুলত!

সে দিনের কথা বলতে লজ্জায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসলেও, আজ বলার প্রয়োজনটা খুব বেশী করেই অনুভব করছি। কয়েকদিন থেকে শরীরটা ভাল ছিল না, তবুও সংসারের বাঁধা নিয়ম-গুলোকে একভাবে মেনে চলেছি, আজ আর তা সম্ভব হ'ল না! মাথাটা শুধু ধরেনি, উষ্ণ একটা তাপে দেহটাকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল!

শুয়ে রয়েছি। তরল ঘরে ঢুকে একেবারে আমার বিছানার ওপর বসে পড়ল। নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসতে যাব, সে বাধা দিয়ে বল্লে,—থাক না কালো।

বাস্তবিক ওঠবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত যেন আমার হারিয়ে গেছ্‌ল, শুয়ে পড়লুম।

জ্বরও হয়েছে দেখছি,—তার শীতল হাতখানা আমার ললাটে স্পর্শ দিতে দিতে কখন যে কপোল ছুঁয়েছে, বা বক্ষে নেমে এসেছে সে সময়টুকুর হিসেব আমার ছিল না! তার স্নেহের স্পর্শে শরীরটা পুলকে শিউরে

উঠলেও বাহ্যিক একটা ছি, ছি মনকে সঙ্কুচিত করে তুলছিল! হাতখানা ঠেলে ফেলবার ইচ্ছাও ছিল না বোধ হয়, অথচ না, এ কি!

আলো এক বাটি গরম দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তরল চট্‌ করে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে আদরের সুরে বললে,—আলো একটু চা খাওয়াবে। কে যেন চাবুকের মত জোরে আমার মর্ম্মে আঘাত করলে। আলোর ওপর তার এই ভাব, এত শুধু স্নেহ নয়। প্রিয়কে কাছে পাবার যে গভীর তৃপ্তি তা যেন চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে।

নিজের শরীরটাকে শামুকের মতো কুঁচ্‌কে ছোট করে অভিমানের কঠিন খোলটির মধ্যে ঢুক্‌লেম এবং তার সান্নিধ্য থেকে সরে পাশ ফিরে শুলুম! মা কোথায় যেন ছিলেন, তরলের গলার আওয়াজ পেয়েই বোধ হয় ঘরে ঢুকলেন। অনেকখানি আগ্রহ জানিয়ে তরল বল্লে—তাই ত মাসীমা, এমন অবেলায়, এসে দেখি যে কালো শুয়ে রয়েছে, শুনলুম তার নাকি জ্বরও হয়েছে? মা যেন তার কাছে একটু সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা করে বল্লেন, আর পারিনে এত সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে! এখন কোথায়ই বা পাই ওষুধ, কোত্থেকেই বা পথ্য যোগাই—এদিকে বাবা হাতে একটি পয়সাও নেই!

মার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, দীনতার বা লজ্জার চিহ্ন মাত্রও তাঁর মুখে ফুটে ওঠে নি !

তরল সুন্দর মুখখানায় সঙ্কোচ এনে বল্লে—আমায় এমন পর মনে করেন মাসীমা !

সে কি বাবা, তা হলে কি এ সব কথা বলতুম !

তরল চলে যাবার পরক্ষণেই সমস্ত শক্তিকে একত্র করে ঝেঁঝে আমি বলে উঠলুম,—আচ্ছা বলত মা, এই যে সামান্য সামান্য বিষয়ে তুমি অমন ভিখিরীর মতো অন্যের কাছে হাত পাতো, লজ্জা হয় না তোমার ! সেদিন পঁচিশটে টাকা নিলে—আজ আবার, এ তোমার ভারি অন্যায় মা !

থাম্ বকিস নি, তরল কি আমার পর রে, শুধু মা আর আমি—

থাক্ মা ওসব শুনতে চাইনে।

সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকার ঘরখানাতে নিবিড় হ'য়ে উঠতে না উঠতেই আলো প্রদীপ হাতে ঘরে এল। প্রদীপের জ্যোতিঃটুকু তার মুখের ওপর পড়ে কী সুন্দর না দেখাচ্ছিল, সেই মুখখানি। আর আমার !—বুকখানায় তুফান তুলে একটা গভীর নিঃশ্বাস বাতাসে মিশে গেল !

আলো ধীরে ধীরে আমার অবিন্যস্ত চুলগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে বল্লে, আচ্ছা দিদি, তরল বাবুকে তোমার কেমন মানুষ বলে মনে হয়।

তখনও ব্যথার স্থানটিতে অবশিষ্ট বেদনাটুকু মাথা চাড়া দিয়ে যে কঠিন কথাটা কণ্ঠ পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিল সেটাকে সামলে নিয়ে শুধু বল্লুম,—বেশ।

জানো দিদি, সেদিন মা তরলবাবুকে কি বলছিলেন—

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বল্লুম,—বোধ হয় কিছু চাইছিল, মার ত লজ্জা নেই।

না, না তোমার বিয়ের কথা—

বক্ষের সমস্ত রক্ত যেন কিসের প্রচণ্ড উত্তাপে সেই মূহুর্ত্তে ফুটে উঠল। আমায় কোন কথা বলতে না দেখে আলো বলে যেতে লাগল, তরলবাবুর মতটা স্পষ্ট ধরা না পড়লেও অমতও মনে হল না।

তবুও আমার কোন উত্তর না পেয়ে সে হেসে বললে,—তাহলে কিন্তু বেশ হয়, না দিদি?

হেসে বল্লুম,—সে তুই বলতে পারিস!

৪

সেদিন দুপুর বেলা তরল ও মা বসে কথা কইছিলেন, আলোও সেখানে ছিল। পাশের ঘরে বসে আমি একখানা কাপড় সেলাই করছিলুম। মাঝের দরজা দিয়ে ও ঘরটা দেখা যাচ্ছিল। একটা কথা কাণে আসতেই, হাতের কাজ ফেলে কথাগুলি শুন্‌তে লাগলুম। মার কি একটা কথার উত্তরে তরল বল্লে,—মাসীমা, জানেন ত অনেকবারই আপনাকে বলেছি, বিয়ে করবার ইচ্ছা আপাততঃ আমার একটুও নেই।

আলো ফস্ করে বলে ফেল্লে,—দিদি কালো বলে, না তরল বাবু, নইলে—

অপমানে আমার সমস্ত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো! শুনলুম মা আমার হয়ে সাফাই গাইছেন,—তা বাবা রংটা একটু কালো বটে কিন্তু কালোর আমার যে সুন্দর শ্রী, এমন তুমি হাজারে একটি পাবে না।

তরলের বিব্রত ভাবটা আমার চোখ এড়াল না। মাথা নীচু করে সে বল্লে—আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন না—

মা তরলের হাত দুখানা জড়িয়ে বল্লেন,—অনাথাকে এ দায় থেকে উদ্ধার করবার ভার তোমায় যে নিতেই হবে বাবা। জানত, আমার আপনার বলতে এ সংসারে কেউ নেই।

সত্যি, মা আমায় নিয়ে যে কতখানি ভাবনায় পড়েছেন, এই কথা কয়টিতে আজ সেটা ধরতে পারলুম। নিজের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা জেগে উঠলো। সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে মনে মনে বল্লুম,—ওগো নারীর সমস্ত সম্পদ দিয়ে সংসারে পাঠিয়ে দিলে যখন—একপোঁচ রংয়ের জন্য তোমার এত কি কার্পণ্য হয়েছিল গো! বুকের রক্ত জল হয়ে টস্-টস্ করে চোখ দিয়ে গড়াতে লাগল। আমার জন্য আজ মাকে কত হীনতা, লজ্জা

না সহ্য করতে হচ্ছে। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে বলি—এই নির্দ্দয় লোকটা যে নারীর হৃদয় নিয়ে খেলা করতে চায়, অথচ খেলা শেষে সেটাকে পরিত্যক্ত মাটির পুতুলের মতোই দূরে ছুঁড়ে ফেলতে, যার প্রাণে একটুও দরদ জাগে না, হ'ক সে ধনী, হ'ক সে সুন্দর—

উত্তেজনার আবেগে ছুটে ছাতে চলে গেলুম।

কয়েকদিন তরলবাবু কেন জানিনি আর এলো না। তার অনুপস্থিতির কষ্টটা ক'দিনই মনের মধ্যে—কি যেন একটা অভাবের হাহাকার টেনে তুলছিল! সামনের অগ্রহায়ণে, আমায় বিদায় করবার একান্ত আগ্রহে মা উঠে পড়ে লাগলেন! পরিচিত অপরিচিত কাউকেও অনুরোধ করতে বাকী রাখলেন না—বাইরে আলাপী দু'চার জনকে চিঠি লিখতেও কসুর করেন নি। এদিকে অগ্রহায়ণও খুব দ্রুত শেষ হয়ে আস্‌ছিল।

এই কটা দিন না আসার পরে, তরল যেদিন আবার এসেছিল মা তখন বাড়ী ছিলেন না, আলো রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। আমি একটা সেলায়ের কলে ছেঁড়া বালিসের ওয়াড়টাকে মেরামত করতে মনোযোগ দিয়েছিলুম!

আজ আর কিন্তু তরলের কাছে মোটেই সরল হতে

পারছিলুম না। সেদিনের সেই কথার পরেও, সে কিছু-মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে তেমনি মধুর হাসি হেসে বল্‌লে—এই যে কালো, মাসীমা কই গো।

আমার কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই নিজেই আবার বল্লে—এ'কদিন আসতে পারি নি, যে ঝঞ্ঝাট। হ্যাঁ, শুনলুম তোমার নাকি বিয়ের খবর চলছে। বেশ, দেখ আমাদের ভুলে যেওনা যেন। বলে আমার হাতখানা ধরে নাড়া দিলে।

কথাগুলো শুনছিলুম, আর আগুনের হল্‌কার মতো, সেগুলো সারা দেহটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। তার হাত ধরবার স্পর্দ্ধা আজ আর যেন কোন মতেই মেনে নিতে পারলুম না—অথচ এ আজ নতুন নয়। ঝট্‌কায় হাত-খানা ছাড়িয়ে নিয়ে অধৈর্য্য হয়ে বলে ফেল্লুম,—হাত ছাড়ুন! আপনি আমায় একলা পেয়ে অপমান করতে সাহস ক'র্‌ছেন বুঝি?

লজ্জার একটু ক্ষীণ আঁচড়ও তাকে স্পর্শ করতে পারলে না, হাসতে হাসতে বল্লে—ও, আচ্ছা মাপ ক'রো। হ্যাঁ চল্লুম তবে।

পিছন ফিরে সে চলে যাচ্ছিল—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না, ছুটে গিয়ে

মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সেই পরিত্যক্ত হাতখানাই আবার টেনে তুলে নিয়ে দু'হাতে আমার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে সাগ্রহে বল্লুম,—যেতে পাবেন না, মার সঙ্গে দেখা না করে।

তখনও তার হাতের মধ্যে আমার হাতখানা ছিল। একটু মৃদুপেষণ করে তরল বল্লে,—পাগল, তোমায় একটু রাগাচ্ছিলুম। আলো কই ?

যতখানি আগ্রহে তার হাতখানা ধরেছিলুম, বুঝি তার চেয়েও সহস্রগুণ ঘৃণায় হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বল্লুম—কি জানি।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি তার চোখদুটি কি চাঞ্চল্যে চারদিকে ঘুরছিল। সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল। মনে হল এতক্ষণ বুঝি একটা বিষাক্ত সাপের জীবন্ত ফণা মুঠোর মধ্যে নিয়েছিলুম। এ হঠকারিতায় তরলের ওপর যত না রাগ হচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী রাগ আসছিল নিজেরই ওপর ! এই যে নিজের যৌবনকে তার চোখের সাম্‌নে ধরে তাকে প্রলোভিত করবার দুর্জ্জয় বাসনা, এ যে পুরুষের কাছে সমস্ত নারী-জাতির অপমান। বুকের মধ্যে আগুনের তুফান এমন প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলছিল, তাতে নিজকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিলুম না। ঘর থেকে

বেরিয়ে গেলুম। মা স্নান শেষ করে কাপড় ছাড়ছিলেন, আমায় দেখে বল্লেন—তরল এসেছে না? তাকে একলা রেখে চলে এলি, বেশ বুদ্ধি তোর।

তখনও তরঙ্গের ঝাপ্টাঝাপ্টিতে সমস্ত হৃদয়টা দুলছিল, বলে উঠ্‌লুম,—তোমার তার কাছে স্বার্থ আছে, তুমি গিয়ে তার, খোসামুদী কর। তারপর সেখান থেকে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দু'হাতে মুখখানা গুঁজে শিশুর মতই কাঁদতে লাগলুম। বাবার স্নেহের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। তিনি থাকলে এই লোকটা আজ তাকে এমন পুনঃপুনঃ অপমান করতে সাহস পায়, সাধ্য কি! মনের আবেগে অনেকক্ষণ চ'খের জল ফেলতে লাগলুম!

কানপুর থেকে কে যেন একখানা পত্র লিখেছিল। প্রজাপতির দূত হয়ে পত্রখানা মাকে যে সংবাদ দিয়েছিল, তারই জন্য তরলের খোঁজ পড়েছিল। সন্ধ্যের সময় সে পৌঁছুতেই মা আগ্রহের সঙ্গে পত্রখানা তার হাতে দিয়ে বল্লেন—এর একটা জবাব বাবা, তোমায় দিয়ে দিতে হ'বে। তুমিই বাবা, যা হয় ব্যবস্থা করে, মেয়েটাকে পার করে দাও। আমায় দায় থেকে বাঁচাও।

পত্রখানার ওপর চোখ বুলিয়ে তরল বললে—বেশ

হবে এ ছেলেটি হ'লে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়, মা আছেন, আর কেউ নেই। সংসারে কালোই হবে একা গিন্নী। খরচাও বেশী দিতে হবে না। চিঠি পড়ে বোঝা যাচ্ছে—কেবল বিয়ের খরচাটা চায়।

হতাশায় মুখখানা কালো করে মা বল্লেন—জান ত বাবা, তাই বা এখন পাই কোত্থেকে। চিঠিখানা পড়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে, এ সুযোগ আর হবে না। তুমিই বাবা আমার এক মাত্র ভরসা। তোমায় ত পেলুম না, তোমার দয়া থেকেও কি—

মার অৰ্দ্ধসমাপ্ত কথার মাঝখানেই তরল বল্লে—আপনি কিছু ভাববেন না মাসীমা, এ বিয়ের সমস্ত খরচা আমার। আপনি চিঠি দিয়ে কথা পাকা করে ফেলুন।

আশ্বস্তির একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে মা তরলকে আশীর্ব্বাদ করলেও, আমার মনে তীব্র একটা ব্যথা খোঁচা দিতে লাগল। ব্যঙ্গভরে মনে মনে বল্লুম—কী দয়া!

এরপরে তরলের সামনে নিজেকে দাঁড় করাবার আগ্রহ ত ছিলই না বরং সে সম্বন্ধে আরো সচেতন হয়ে উঠছিলুম। তরল অনুযোগ ক'রে মাকে বোধ হয় কিছু বলেছিল, মা আমায় একদিন বল্লেন,—একি মা

কালো, আপনার পেটের ছেলেও আজকাল এমনটি করে না, তরল আমার তাই করেছে, তুমি ওকে অমন—

কথাটা শেষ হবার ধৈর্য্য হারিয়ে. ফেলে তীব্রস্বরেই উত্তর দিলুম,—সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য—ছি, মা—অমন ছলা কলা করে মন ভুলিয়ে কাজ আদায় করার কথা ভাবতেও যে লজ্জায় আমার বুকখানা অসাড় হয়ে আসে।

মা রেগে বল্লেন, লজ্জা হয় না তোর, মানুষের মহত্ত্বটা বুঝি চোখে পড়ে না।

ব্যঙ্গ করে বল্লুম,—মহত্ত্ব বই কি—আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলুম কিন্তু বুকের কাছে আট্‌কে গেল। খানিক চুপ করে থেকে দৃঢ়স্বরে বল্লুম—ওর সাহায্য ভিন্ন যদি আমার বিয়ে নাও হয়, তবুও মা সত্যি বল্‌ছি, কক্ষণো বেরুবো না ওর সামনে।

বুকের মাঝে যে ঝাঁঝটা জমে উঠেছিল, হঠাৎ গলে গিয়ে দু'চোখ বেয়ে গড়াতে লাগল।

মা নীরব হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে, কার স্পর্শে মুখ তুলে চাইতেই সমস্ত অন্তরটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। স্তম্ভিত হ'য়ে ভাবলুম—কী স্পর্দ্ধা! পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মমতা-মাখান

স্বরে তরল বল্লে—কাঁদচো কালো! ছি! সে তার রুমালখানা বের করে আমার চোখ মুছিয়ে দিতে অগ্রসর হ'ল! আমার সমস্ত চেতনা কে যেন যাদু মন্ত্রে লোপ করে দিলে। বাধা দেওয়ার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত আমার রইল না। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি—ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির আভা, চোখে শয়তানীর ছায়া লুটোপুটি খাচ্ছে। বেশ অনুভব করলুম, জলন্ত লোহার তপ্ত স্পর্শের মতো দু'খানি অধর আমার ঠোঁট দুখানা পুড়িয়ে দিয়ে গেল। শিউরে উঠে দু'হাতে চোখ বুজে কাঁপতে লাগলুম।

কানপুরের সেই পত্রখানার জবাব আজ এসেছে। তাঁরা রাজি হয়েছেন। এই সামনে ফাল্গুন, তারই একটা শুভদিনে তাঁরা আমায় মুক্তি দিতে আসবেন। অপরাহ্নের নিস্তেজ রৌদ্রে চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়িয়ে, ছাতে বসে আজ অনেক কিছু ভাবছিলুম। একটু একটু করে সমস্ত রোদটা পৃথিবীর চারপাশ থেকে উপে গেল, যেন সব আলো জমে উঠলো, অস্তগামী গোলাকার ঐ লাল সূর্য্যটাকে ঘিরে। তারপর কখন অস্তাচলের দেশে দেওয়ালীর দিপালী উৎসব সুরু হ'য়ে গেছল কিছু টের পাইনি, হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে সেই দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বসে রইলুম।

তরলের কথা ভাবতে গেলেই একটা আনন্দের স্পন্দন সমস্ত শরীরটাকে দোলা দিয়ে যেত। কিন্তু তরলের এই ঔদাসীন্য অমৃতের আঘাতের মতোই আমার বুকখানাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছিল। এই যে তরল কত না সোহাগে, কত না আদরে প্রতিদিন আমাকে প্রলোভিত করে তুলেছিল, ছল করে যখন তখন আমাকে দেখবার যে সুখ তার চোখে ফুটে উঠতে দেখেছি, নিজে থেকে যেচে কত না উপহার সে আমাকে দিয়েছে, এই শরীরটার সঙ্গে আমাকে যদি তার না চাইবারই ইচ্ছা ছিল, কেন, কেন সে অমনভাবে আমায় প্রলোভিত করে, আমায় সুখস্পর্শ দিয়ে—

সমুদ্র-মন্থনের সময় সুধা উঠ্‌তে যেমন বেশী সুধার আকাঙ্খায় গরল উঠেছিল, তেমনি তরলকে ভাল করে দেখতে গিয়ে, কল্পনায় তার সুখস্মৃতি এত বেশী মনে উঠ্‌ছিল যে শেষটায় সত্য সত্যই গরলের মতো পূর্ণ একটি বিষের পাত্র যেন তরলের রূপ ধরে আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। এই তরল! না, তাকে কখনো ভালবাসি না। তরুণ জীবনের যাত্রার পরম মূহুর্ত্তটিতে অকাল বৈশাখীর মতো যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে জীবনের যাত্রার পথে শান্তি আনতেই

খে হবে! এই ত গোটা কতক দিন! তারপর—! ভবিষ্যতের চিন্তায় আবার কল্পনার রঙিন স্থতো বুনতে লাগলুম। কিন্তু তবুও তরলের চিন্তা গোলাপের কাঁটার মতো অন্তরকে বিদ্ধ করতে লাগলো। নীচে থেকে আলোর শুভ্রাধব স্পর্শে শাঁক বেজে উঠলো। অন্ধকার দু'খানা কালো ডানা মেলে যেন পৃথিবীর আলোটাকে আটকে ফেল্‌লে। ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলুম।

৫

রোজই দেখি মা ও তরল সর্ব্বদাই যেন কিসের পরামর্শে ব্যস্ত। অবশ্য বুঝলুম—আমার বিয়ের সম্বন্ধের কথা নিশ্চয়। আজকাল আলোর ওপর তরলের আকর্ষণটা আমার বেশ একটু বেশী বলেই চোখে ঠেকৃত। অথচ আলো যেন এই বিয়ের কথা শোনা অবধি একটু ম্লান। সেদিন থেকে তরলের সামনে না বেরুলেও হয়ত তার সামনে দিয়েই চলে যেতে হয়, দৃষ্টি যে তার মুখের ওপর পড়ত না, তা নয়। দেখবার এই যে

দুর্দ্দমনীয় বাসনা, আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে অন্তরের প্রতিজ্ঞা অনেক সময়ই ভুলিয়ে দিত।

অপরাহ্নে মা ও তরল কি সব কথা কইচে! পাশ দিয়ে যাবার সময় আজ দৃষ্টিতে খুব খানিকটা ঘৃণা ভ'রে তার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত উদাসীনভাবে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম, মার ডাকা সত্ত্বেও কোন উত্তর না দিয়ে। এই ঔদাসীন্যে যদি তরলকে একটুও আঘাত দিয়ে যেতে পারি—ওঃ, সে কী-ই না সুখের হয়! দিন যতই এগিয়ে পড়তে লাগল, আমিও কঠিন হবার চেষ্টায় মনকে তৈরী করে তুলতে লাগলুম কিন্তু সত্যি, প্রতি মূহুর্ত্তেই ভয় হ'তো অন্তরকে ভাল করে যাচাই করতে গিয়ে ধরা না পড়ি! নিজেরই কাছে নিজের এই ধরা পড়বার লজ্জাও যে আমার সইবে না।

আলো আজ কাল প্রায় সব সময়ই আমার পাশে পাশে থাকে। আমার সামান্য সন্তুষ্টির জন্য তার কত না আগ্রহ। তরলের সুন্দর মুখখানা যে আলোর হৃদয়কেও আলোড়িত করেছে—সে যেন আমার মনই বলতে চাইছে। তবে বোধ হয় তরলও আলোকে—কিন্তু তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারছিলুম না কেন?

ফাল্গুনের শুভদিন দেখে কানপুর থেকে তাঁরা তিনজন

এসেছিলেন। এক পুরোহিত, দ্বিতীয় নায়ক, তৃতীয়টি বরের কর্ত্তা হয়ে। আমাদের বাড়ীতেই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তরলকে এ কয়দিন কী উৎসাহে না কাজ করতে দেখেছি। সমস্ত সময়টুকুকেই যেন সে কাজে লাগিয়ে নিচ্ছে। তার সুন্দর অঙ্গকান্তি ক্লান্তিতে মলিন না হয়ে আরো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তরলকে সাহায্য করতে আলো ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিল না। এরা দুজনে আমার মরণ-যজ্ঞের অয়োজনে যেন কত না ব্যস্ত। আলো—আমারই ছোট বোন আলো, এই শয়তানটার এমন কী প্রলোভনে পড়েছে যে স্বাভাবিক নাড়ীর টান পর্য্যন্ত ভুলে এর সাহায্যে এতখানি উন্মুখ হয়ে পড়েছে।

বিবাহের দিনটি, আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। শুধু আমার কেন, সকল নারী জাতটারই যে। এই বিবাহের পরমূহূর্ত্তেই যে অন্য কোন্ এক ভাগ্যদেবতা এসে স্ত্রীজাতির আরব্ধ সমস্ত জীবনটাকে মূহূর্ত্তে ওলোট্-পালোট্ করে, নতুনের পথে চালনা করে দেয়। এই নতুনের মোহ কোন্ কিশোরীকে না চঞ্চল কোরে তোলে? কিন্তু আমার আনন্দ, না বিষাদ!—কোনটাই বোঝবার

অনুভূতিও আমার ছিল না। হৃদয় বিদ্রোহী হতে চাইছিল প্রতি মুহূর্ত্তেই।

আলো আমায় ছাতে নিয়ে ঘটা করে সাজাতে লাগল। কত না সুখের, প্রিয় দয়িতের সঙ্গে জীবন-সূত্রের প্রথম যোজনার দিনে—যে আনন্দের রক্তস্রোত প্রতি তরুণীর বুকের মধ্যে ঢেউ খেলতে থাকে, সেই রমণীয় দিনটিও আজ আমার কাছে কেন এত তিক্ত বোধ হচ্ছিল!

হঠাৎ তরলকে ছাতে দেখলুম—আমারই সামনে দাঁড়িয়ে। আলোকে গোটা কয়েক টাকা দিয়ে বল্লে—আলো, আমায় বাইরে যেতে হচ্ছে, মালা আনতে, মাসীমা ত দিন ভোর উপোসী, ও-ঘরে শুয়ে আছেন, এই টাকা কটা রেখে দাও।

আমার দিকে তাকিয়ে সে চলে গেল। ওঃ এই লোকটাই আমার জীবনের পথে এসে আমার জীবন তিক্ত করে দিয়ে গেল। যাক্—সমস্ত দুর্ব্বলতা দূরে ফেলতে হবে। ওই মুখোস-পরা সুন্দর শয়তানটাকে কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না, যে তার জন্য আমার হৃদয়পদ্ম ম্লান হয়ে গেছে। বরং নিজেকে ওর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে দেখাতে হবে, যাতে ও বুঝুক তোমার জন্য আমার যায় আসে না। তাতে কি সত্যি

লোকটা একতিলও আঘাত পাবে না। কিন্তু এত কল্পনা! সত্যি এমন দিন কি আমার আসবে না, যেদিন আমার সমস্ত কাঁটা গোলাপ হয়ে ফুটবে, সমস্ত ব্যথা মধুময় হয়ে হৃদয়কে রঙীন করে তুলবে—ওগো সেদিন কবে গো কবে!

মধ্যরাত্রে লগ্ন। সম্প্রদানের সময় তরলই আমার হাত ধরে নিয়ে আসতে গেল। সে একখানি হাতে আমার বাহু স্পর্শ করতেই মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওগো ভগবান, এই লোকটাকে কি সংসারে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছিলে—আমার মৃত্যুবানের মতোই। নিরুপায় হয়ে তারই সঙ্গে সম্প্রদান স্থলে এলুম। বাইরে সানাই বাজছিল, মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে, সমস্ত নিশীথিনীকে যেন আকুল করে! নিজের হৃদয়ের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে, বুঝতে পারলুম না, এ কোন স্থর—আনন্দের না বিষাদের!

পুরোহিত-উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে হাতখানা যখন তাঁর হাতের ওপর রাখলুম, কিসের একটা বিপুল স্পন্দন সারা শরীরটাকে যেন দোলা দিয়ে গেল। একটা আনন্দের বিহ্বলতাও যেন অনুভব করলুম। মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকে বল্লুম, ওগো, এঁকে ভালবাসবার শক্তি না দাও, এঁর ওপর নির্ভর করবার শক্তি দিও প্রভু!

আমাদের চোখোচোখি হবার অবসর দেবার জন্ত যে কাপড়খানি আমাদের মাথার ওপর দেওয়া হয়েছিল, তারই নীচে দিয়ে একটা আলো তুলে ধ'রে তরল বল্লে,—ভালো করে দেখে নিও কালো !

তাঁর দিকে চাইতে গিয়ে তরলের মুখের দিকে তাকিয়ে ফেললুম। দেখি তার ঠোঁটের ওপর ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছে। তার চোখের কোণে নিষ্ঠুর আমোদের উজ্জ্বল দৃষ্টিটা তারই হাতের আলো বেশ জাগিয়ে তুলেছে।

মালা-বদলের সেই শুভমুহূর্ত্তটিকে সম্পূর্ণভাবে অশুভ করে তুলতে যে শয়তান এই রমণীয় গোপন স্থানটিতে পর্য্যন্ত মাথা তুলেছিল—তারই নির্ম্মমতার কথা ভাবতে গিয়ে হাতের মালা হাতেই যেন আটকে গেল। মূর্চ্ছিতভাবে ঢলে পড়লুম। চারিদিকের কোলাহল অস্পষ্ট হয়ে কাণে আসতে লাগল।

আলোর কথা

১

সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। দিদির বিয়েতে আমাদের ছোট বাড়ী খানি আজ বেশ একটু পুলক-চঞ্চল। দু'চার জন পাড়া-প্রতিবেশীও এসেছেন নিমন্ত্রিত হ'য়ে। ফুলে, মুকুলে, গানে, গন্ধে, মাল্যে,আলোয়—কত না রকমে এই উৎসবকে জয়শ্রী-মণ্ডিত করে তুলতে, এই সব সেনাগুলি উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়ায়,—দুঃখ, বেদনা, শোক, অভাব—এগুলি সেদিনকার জন্য পরাজিত বন্দীর মতোই উৎসব-মন্দির থেকে নির্ব্বাসিত।

কিন্তু তবুও এ বিয়েকে আমি ঠিক অন্তরের সঙ্গে নিতে পারছিলুম না। কেবল তরলবাবুর গ্রাস থেকে দিদিকে বাঁচাবার অত্যধিক আগ্রহই, আমার এই আনন্দশূন্য হৃদয়কেও পুলকে ভরিয়ে দিয়েছে।

বিয়ের আসরে দিদি কেন যে হঠাৎ মূর্চ্ছিতের মতো এলিয়ে পড়ল, কারণটা অন্যের কাছে যতই অজ্ঞাত থাকুক না কেন, আমি মন দিয়ে তার ক্ষতের আসল জায়গাটির তীব্র ব্যথা অনুভব করতে পেরেছিলুম, তাই আমার প্রাণ যে কতখানি কাতর হ'য়েছিল, সে জানেন আমার অন্তর্য্যামী! তরলবাবু তাড়াতাড়ি খানিকটা ঠাণ্ডা জল মাথায় চাপ্‌ড়ে দিয়ে, পাখার বাতাস করতে লাগলেন। আমি তার হাত থেকে পাখাখানা কেড়ে নিয়ে, তাকে দিদির চোখের স্বমুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেই বাতাস করতে লাগলুম।

পরের দিন সকালে—দিদিকে বিদায় দেবার সময়,—যে দু'টি বোনে এতকাল একসঙ্গে পালিত হ'য়ে এসেছিলুম, তারই বিচ্ছেদের দুঃখ্ আজ আমাকে এমনিই কাতর করে তুলেছিল যে দিদির আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় আনন্দের কল্পিত বাঁধ দিয়েও অশ্রুর গতিরোধ করতে পারি নি। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে জীবনে এই প্রথম দিদির পায়ের

ধূলো মাথায় নিলুম। তার হাতখানি ধরে মনে মনে প্রার্থনা করলুম,—ওগো ভগবান, ওর মনের এতদিনকার সঞ্চিত দহন দূর করে, সেখানে শান্তির ঝরণা বইয়ে দিও। ব্যর্থ-প্রেমের-স্মৃতির বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার ওকে শক্তি দিও!

তারা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ জান্‌লা দিয়ে বাইরে পথের দিকে চেয়ে রইলুম, অকারণে! কিছুতেই মন বসছিল না। মা সব সময়েই তরলকে আশীর্ব্বাদে প্লাবিত করে তুলছিলেন। মুখ দেখে বেশ বুঝলুম, মুক্তির আনন্দ তাঁর মুখ চোখ দিয়ে উথলে পড়ছে।

তরল বাবুকে দেখে আজ আর খুসী হ'য়ে উঠতে পারলুম না। মনে পড়ল, তার সঙ্গে আলাপের প্রথম দিনটির কথা—তার সুন্দর মুখখানায় যে আকর্ষণী শক্তি ছিল—কথায় যে মোহ ছিল! সেইদিন থেকে এই ছোট পরিবারটির ওপর তরলবাবু পরিচয়ের একটা মধুর ছাপ এঁকে দিলেন। দরকারে, অ-দরকারে তিনি আমাদের কত না প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠলেন।

তারপর একদিন মা যখন তরলের হাত দু'খানা চেপে ধ'রে বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় সমস্যা, বাঙালী সমাজের সব চেয়ে বড় দায় থেকে উদ্ধার হবার জন্য তার শরণ নিয়েছিলেন, পরিচয়ের নিবিড় মোহে, তাঁর আশা যে

কতখানি উঁচুতে উঠেছিল, এই ধনী ও সুন্দর যুবকটিকে আপনার করে নেবার লোভে তিনি যে কতখানি অসম্ভবকেও সম্ভব মনে করেছিলেন, সেটা তিনি মোটেই বুঝতে পারেন নি। আর সেদিন তার সম্মতি না পেলেও অসম্মতির অস্পষ্ট জবাবে মায়ের সে কল্পনায় গঠিত তাসের বাড়ীখানা ভেঙ্গে যায় নি। আমারও মনে সেই থেকে ধারণা জন্মে গেছ্‌ল, দিদিকে তরল বাবু গ্রহণ কর্ব্বেন। কতখানি শ্রদ্ধায় মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল,—গরীব দেখে যার এত দয়া, তার মহত্ত্ব, আমার বুকখানাকে গর্ব্বে আচ্ছন্ন করে তরল বাবুর প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তুলেছিল। তিনি যখন সোহাগে আমার বেণীটা ধরে নাড়া দিতেন, আমি আনন্দে তাঁর হাতখানা আরো জোরে চেপে ধরতুম। দিদির সৌভাগ্যের কথা মনে ক'রে আনন্দে তাকে তরল বাবুর কথা নিয়ে রহস্য করতুম। ভেবেছিলেম, দেবকুমারের মত সুন্দর, পবিত্র এই তরল বাবু।

কত না জিনিষ আমাদের দু'জনকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন, অবশ্য তাঁর মধ্যে সেরা জিনিষগুলিই আমি পেয়ে এসেছি। তখন ভাবতুম, দিদিকে ভাল উপহারটা দিতে—ভালবাসার একটা যে মধুর গোপন লজ্জা, সেটা

প্রকাশ হ'বার সঙ্কোচই হয়ত ভাল জিনিষগুলির অধিকার আমায় দিত। তাই মনে হ'য়ে কৌতুকে আমার মন খুসীতে ভরে যেত।

তরল বাবুর তরফ থেকে দিদির প্রতি তার ভাল-বাসার ইঙ্গিতও আমার দৃষ্টি থেকে এড়ায় নি। আড়াল থেকে এটাও চ'খে পড়ে গেছে, কত দিন দিদিকে বাহুবেষ্টনে ধরে সাদরে কথা বল্‌তে। আমিও তার আব্দার থেকে রেহাই পাই নি। কোন দিন পেছন থেকে এসে চোখ ছু'টি চেপে, কখনো চিবুক ধরে আমায় যে সোহাগটুকু দেখাতেন সে সবই আমায় মেনে নিতে হয়েছিল। তাতে মনে যে অসন্তোষ জাগত তা নয়, বরং ভাবী কি একটা মধুর সম্বন্ধ মনের মধ্যে জেগে, মনের সমস্ত কোণ পুলকে উজ্জল করে তুলত। কিন্তু তখন যদি ভবিষ্যতের যবনিকার আড়ালটা আমার চোখে পড়ত, দেখতুম সেখানে শিকারীর বাণ আমারও বুক লক্ষ্য করে উঁচিয়ে রয়েছে এবং সেই দিনটিও একদিন সত্য হ'য়ে তরল বাবুর আসল পরিচয়টি আমার কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল।

সময়ে সত্যই মার কল্পনায় গড়া তাসের বাড়ীখানা ধসে গেল। অসম্মতির সুস্পষ্ট আঘাত ক্রমে দিদির মুখে

চোখে কালো আর ঘন হ'য়ে জমে উঠল। জীবনে বসন্ত আসে একবারই, সেই বসন্তে একজনকে মন আপনার বলে নিতে চায়, কিন্তু যদি না পায়, তবে তো নতুন করে মনের বনে আর কোকিল ডাকে না। জীবন যে কতখানি তিক্ত হয়, সেই জানে।

দিদিকে তরল বাবু—এ যেন একটা প্রাণীকে বশ ক'রে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ানোর মতোন—এতদিন বশ করে রেখেছিলেন। এটা যে মুহূর্ত্তে ধরা পড়ল, সেই মুহূর্ত্তে তার কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, দিদিকে যে কতখানি যুঝ্‌তে হয়েছিল, তার পরিচয় পেয়েছিলুম, সেইদিন। তরল বাবুর চোখের সামনে সে নিজেকে বড় একটা দাঁড় করাত না। সেই নিয়ে মা একদিন অনুযোগ করেছিলেন। কী ক্ষোভ ও জ্বালায় দিদি তার উত্তর দিয়েছিল, না বেরুবো না ওর সামনে, এতে যদি দুটি ভাত্‌ দিতে তোমরা না চাও, বেশ খানিকটা বিষই না হয় দিতে বলো তরল বাবুকে, তাতে তার খরচও কম হবে, তোমরাও দায় থেকে বাঁচবে!

আজ তরল বাবুর দিকে চাইতেই অতীতের এই সব চিন্তা থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল; কাজেই সে যখন ঘরে ঢুকলো অন্য অন্য দিনের মতো তাকে অন্তরের সঙ্গে

নিতে পারছিলুম না। মনে কেবলি খোঁচা দিচ্ছিল যে সেই দিদির জীবনকে অভিশপ্ত করে দিয়েছে। তিক্ত মনে তার কথার দু'একটা জবাব দিলুম মাত্র।

রাত্রে মা ও আমি কথা কইছিলুম। সেই এক কথা কতবার শুনেছি। সত্যই যে তরল বাবুর ঋণ অপরিশোধনীয় কিন্তু কেন যেন মার উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় তেমন সায় দিতে পারি নি, কোথায় যেন একটি ছোট কাঁটা বিঁধে ছিল, মাঝে মাঝে তার বেদনা আমায় কষ্ট দিচ্ছিল!

তরল বাবু যেমন রোজ আসতেন, এখনও তেমনি এসে থাকেন। আজকাল আমি যে তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি এবং তিনিও যে ঘনিষ্ঠতার নিবিড় বন্ধনে, আমায় বাঁধবার কোনই ত্রুটী করেন না, এ সত্যটা দু'জনের মনের দর্পণে খুবই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্ছিল। সেদিন আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে এসে, বোধ হয় এরই একটা নিষ্পত্তির আগ্রহে তিনি প্রথমেই বল্লেন,—আলো এ তোমার ভারী অন্যায় কিন্তু, যখনি আমি আসি, তখনি তুমি মুখখানা ভার করে ফেল, আগে ত তুমি এমন ছিলে না!

কথাটা যে অতি বড় সত্য, সেটা আমারও জানা ছিল এবং এর কারণটাও যেদিন থেকে আবিষ্কার করেছি, সেই দিন থেকেই আমার এই পরিবর্ত্তনের সূচনা।

২

বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। আজ তিন চার দিন থেকে মার জ্বর। সংসারে আমাদের সাহায্য করতে পুরোণো কালের বুড়ো এক ঝি। তার কাছে থেকে যত না সাহায্য পাওয়া যেত, তাকে সাহায্য করতে হত তার অনেক বেশী। তরল বাবু এ ক'দিন আসেন নি। তার আসাটা অন্য সময় যতই না চেয়ে থাকি না কেন—এখন তার আসাটা প্রতি মুহূর্ত্তেই মন চাইছিল, আর চোখ হয়ে পড়েছিল ব্যাকুল।

যার ওপর নির্ভর করে এতদিন কেটেছে, তাকে অন্তরের সঙ্গে না চাইলেও, নির্ভরতার দুর্ব্বলতায় এতদিন ধরে আমাদের মনের ওপর সে বাঁধন নাগপাশের মতোই পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল—যার জন্য এই অসহায় অবস্থায় তার স্থিতিটা সব সময়ের জন্যই খুব বড় হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে।

বিকেলে, ঘর-দোর পরিষ্কার করে, নীচে উঠোনের পাশে কলে গা ধুচ্ছি, পরিচিত জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ কাণে আসতেই অতি উৎকণ্ঠায় সেইদিকে চোখ ফেরালুম। নিজের এই ভেজা অসংযত কাপড়-চোপড় কোন কিছুই মনে পড়ল না। সেই শব্দ কোন পরমাত্মীয়ের আগমন সূচনার মতোই আমার কাছে প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠল। ব্যগ্রকণ্ঠে বল্লুম,—এই যে তরল দা', ওঃ এ ক'দিন আমরা আপনার কথা কত না ভেবেছি।

তরল বাবু হেসে বল্লেন,—বটে, আমার খুব ভাগ্যি ত ?

কথার স্বরটার মধ্যে ও হাসিতে কোন্ ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল, জানবার মতন মনের অবস্থা আমার তখন ছিল না, কিন্তু মনে হচ্ছিল—যেন তার চোখে সে ভাবটা প্রকাশ হয়েছিল !

বল্লুম—মার বড্ড অসুখ যে—

তিনি গল্প ফেঁদে বসলেন—কেন তিনি এ ক'দিন আসেন নি, কী কাজে ব্যস্ত ছিলেন—এই সব।

তরল বাবুকে প্রথমে দেখে যতখানি উচ্ছ্বাস বেরিয়ে পড়েছিল, তার আবেগ কমে গিয়ে, তার দৃষ্টির মধ্যে যে লালসা ফুটে উঠেছিল সেটা আমার চখে আঙুল দিয়ে নিজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিলে। বেশ লজ্জা পেলুম। ভিজে কাপড়খানি ভাল করে বুকের উপর জড়িয়ে ফেলে বল্লুম,—আপনি ওপরে গিয়ে বসুন, তরল দা', আমি—

কিন্তু তবুও সে বলে যেতে লাগল,—মাসীমার অসুখ? কবে হো'ল, কেমন আছেন!

তাকে স্পষ্ট সেখান থেকে চলে যাবার জন্য বলার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছিল কিন্তু বলতেও পাচ্ছি না, অথচ তার দৃষ্টির আঘাতে খুবই সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছিলুম। বেশ বুঝলুম, এই লজ্জাকর অবস্থাটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এই লোকটার ভদ্রতার ওপর নির্ভর করলে চলবে না, জোর করেই বলতে হো'ল, আপনি যান; কাপড়খানা কেচেই আমি ওপরে যাচ্ছি, সেখানে সব বলব। আপনি বসুন গিয়ে।

এবার তরল ওপরে চলে গেল। একটু একটু গানের

গুণ গুণ শব্দে যেন তার মনের খুসী বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

কাপড়-কাচা শেষ করে ওপরে এসে দেখি—মার বিছানার ওপর তরল বাবু বসে মার সঙ্গে কথা কইছেন। আমায় দেখে বল্লেন,—আলো, মাসীমার অসুখটা আমার যেন ভাল ঠেকছে না। আমি এখুনি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।—বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। আমার কোনো কথা বলা বা শোনা হ'ল না। কিন্তু তার কথা শুনে ভয় পেলুম। মার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কত' কি ভাবতে লাগলুম।

তখনও বেলা আছে কিন্তু শেষ হবারও খুব দেরী নেই। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে তরল বাবু ঘরে ঢুকলেন। মা অচৈতন্যের মতো পড়ে আছেন। ডাক্তার খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে, তরল বাবুকে ইংরেজিতে কি বল্লেন। একখানা কাগজে কি সব লিখে দিয়ে বল্লেন,—এই ওষুধটা, এখুনি আনিয়ে নিন। এখন একবার আর রাতে নিয়ম মত খাওয়ান চাই। একটা মালিসও দিলুম। এটাও ভাল করে মালিস হ'য় যেন। অবস্থা খুব ভাল নয় কিন্তু!—ডাক্তার বাবু চলে গেলেন।

বুকের মধ্যে যত রাজ্যের ভয় দেখা দিলে। তরল বাবুকে নিরুপায়ের মতো কাতর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম,—কি হ'বে তরল দা'—

গম্ভীর মুখে তিনি উত্তর দিলেন,—ভেব না, বুকে মাত্র সর্দ্দি জমতে স্বরু হ'য়েছে। এখনও ভয়ের খুব কারণ নেই। আমি চট্ করে ওষুধটা তোমায় এনে দি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ভূতের মতন যেন তার বিরাট দেহ নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। আলো জ্বেলে উঠতে পারি নি। এই নিঃসহায় অবস্থায় একলা একটা ঘরে এই রোগী ও আমি। তারপর সামনে দীর্ঘ রাত্রি!—কেমন করে থাক্‌ব! শরীরটা শিউরে উঠলো, বুকের ভিতরটায় দুর্ভাবনার ঝড় বইতে লাগল। তরল বাবু নীচে নেমে যাওয়া পর্য্যন্ত ঘরখানাকে দৈত্যের হাঁ'য়ের মতো মনে হ'তে লাগল, যেন তার মুখের মধ্যে আমি ধরা পড়েছি। এতদিন—এমন কি কালও ত এই বাড়ীতে, এই ঘরেতেই সারারাত থেকেছি। কই, এমন ভয় ত মনে জাগে নি। কিন্তু আজ যেন নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারছি না, মন দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। তখনো তরল বাবুর পায়ের শব্দ নীচে থেকে মিলোয়নি, চীৎকার করেই ডাকলুম—তরল দা'—

এই দুর্দ্দিনে তাকে কত বড় আপনার ব'লে আকড়ে ধরতে চাইছিলুম—কোন কিছুই তখন মনে আসে নি !

বোধ হয় কণ্ঠস্বরে ভয় ও উৎকণ্ঠার পরিচয় এত বেশী ধরিয়ে দিয়েছিল যে তরল বাবু খুব দ্রুত বেগেই ফিরে এলেন, বল্লেন,—কি হ'য়েছে, অমন করে ডাকলে যে।

আমি একলা বাড়ীতে থাক্‌তে পারব না। আপনি যেতে পাবেন না।

তরল বাবু পকেট থেকে দেশলাই বের করে, একটা কাঠি জ্বেলে বল্লেন,—পিদিমটা এগিয়ে নিয়ে এস ত।

প্রদীপটা মিটি মিটি জ্বলতে লাগল। তার অস্পষ্ট আলোয় ঘরখানার সমস্ত দেয়াল জুড়ে যেন ছায়াবাজির খেলা স্থরু হল। আবার বল্লুম,—তরল দা' আমি মাকে নিয়ে একলা থাকতে পারব না।

তাইত, ওষুধগুলো যে আনানোর দরকার এখুনি। লক্ষ্মিটি ঝিকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে দাও, ততক্ষণে আমি এসে পড়ব।

কিন্তু তরল দা, ঝিকে তুমি ত জান-ই, একটু জেগে থাক্‌তে না থাক্‌তে বেহুস হ'য়ে ঘুমুলো ত, প্রলয় এলেও তার ঘুম ভাঙ্‌বার নয়। না, না, আপনি যেতে পারবেন না !

রাস্তার ধারের ছোট বারান্দাটিতে তরল বাবু পায়চারি করতে করতে কি যেন ভাবতে লাগলেন। নীচে রাস্তার গ্যাসের আলোতে কয়েকটি বারো-তেরো বছর বয়সের পাড়ারই ছেলে, রোজের মত আজও গল্প কচ্ছিল— আবার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করে দু' একজন তর্কও তুলছিল! গল্পকর্ত্তা নিজের গল্পের সত্যতা বজায় রাখবার জন্য জোর গলায় নানা যুক্তি বের করলে—কিন্তু যুক্তি-তর্ক কিছুই কানে আসছিল না, আসছিল তার চেয়েও একটা বড় জিনিষ—যেটা চীৎকার! তরল বাবু বারান্দা থেকে ঝুঁকে, রাস্তার ওপর শরীরের অর্দ্ধেকটা বের করে মুখ নীচু করে ডাকলেন—খোকা, শুন্‌ছো, শোন না একবার।

তরল বাবু জোর গলার আওয়াজে সব খোকাই ভোড়কে গিয়েছিল, দু'একটি আবার দৌড় মারলে, কেউ দেয়ালের পাশে লুকিয়ে পড়ল, কেবল একটি সাহসী ছেলে বল্লে,—আপনি কি কাউকে ডাকছেন?

তিনি বল্লেন,—একবার বাড়ীর ভেতর এস ত' ভাই। বড় বিপদে পড়েছি, একটু সাহায্য করতে হবে।

তরলের মিষ্টকথায় ছেলেটির ভয় কমে গেল, সে যাচ্ছি বলে ওপরে চলে এল।

ডাক্তারের লেখা ওষুধ আনবার কাগজখানি ছেলেটির

হাতে দিয়ে তরল বাবু বল্লেন,—এই মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে এই ওষুধ কটা এনে দাও না ভাই।

ছেলেটি রাজী হয়ে চলে গেল।

তরল বাবুকে বল্লুম,—রাত্রে আমি একলা থাকব কি করে? আমার নিজের কণ্ঠ নিজেরই কানে করুণ ও অসহায় মনে হচ্ছিল।

তরল বাবু আমার পিঠে একখানা হাত ধীরে রেখে মমতা-মাখান গলায় বল্লেন,—ভয় কি আলো, আমি নয় রাতে থাকব'খন!

বাস্তবিক এই অসহায় মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করেই তার কাছে ধরেছিলুম। ছেলেটি ওষুধ নিয়ে ফিরতেই তরল বাবু দু'টি টাকা তার হাতে দিয়ে মিনতি করে বল্লেন,—লক্ষ্মীটি আর একটু কাজ করে দাও ভাই। দোকান থেকে কিছু খাবার এনে দিয়ে যাও।

ছেলেটি কিছুমাত্র আপত্তি না করে খাবার আনতে চলে গেল।

রাত তখন বেশ হ'য়েছে। আমার মন ও শরীর দুই-ই এলিয়ে পড়েছিল কিন্তু তরল বাবুর অনুরোধে কিছু না খেয়ে পারলুম না। সমস্ত রাত পাশাপাশি মার বিছানার ওপর ঠায় বসে রোগীর সেবা করে কাটিয়েছি,—দু'জনেই।

ভোরের দিকটায় যখন ক্লান্তি আর শরীরকে কিছুতেই বশে রাখ্‌তে দিলে না, ঢুলতে ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। মুখের ওপর একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে ধড়্‌ফড়্‌ করে জেগে উঠলুম। জেগে দেখি, একই উপাধানে তরল বাবু ও আমি। আমার চুলের কতক অংশ তার মুখের ওপর, কপালের ওপর উড়ে পড়েছে, তার একখানি হাত আমার পিঠের ওপর দিয়ে বুকে এসে পড়েছে! নিজেকে সম্পূর্ণ তারই কবলের মধ্যে দেখলুম। অতি ধীরে, এই বিসদৃশ অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলুম। ইচ্ছে হচ্ছিল, সমস্ত শক্তিকে একবার জাগিয়ে তুলে, দু-হাতে এই লোকটার টুঁটি চেপে ধরি, যে হাতখানা আমার শরীরকে অপবিত্র করবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাকে আচড়ে-কামড়ে জানিয়ে দি, এ তার অন্যায় অত্যাচার! কিন্তু পাছে জেগে তারই আলিঙ্গনের মধ্যে আমায় এ-ভাবে পায়, তারই প্রকাণ্ড খোলা চোখের সাম্‌নে নিজেকে এ-ভাবে লজ্জিত করতে নারীর দৌর্ব্বল্য আমায় পশ্চাদ্‌পদ করিয়ে দিলে! ঘৃণায় শরীর পুনঃপুনঃ কাঁপতে লাগল! কেন কাল ওকে থাকতে বলেছিলুম! এর থেকে যে ভয়ে আমার মরাই ভাল ছিল। কেন, কেন সে—

কিছুতেই স্থির হ'তে পারছিলুম না। নিজের প্রতি

ধিক্কারে মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলতে লাগলুম। নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, তার মর্য্যাদা, তার সম্মান,—তার অজ্ঞাতেই, এত সহজে নিজের অধিকারে নিয়ে এই লোকটা বেশ সুখে ঘুমুচ্ছে! এ যেন একটা ধূমকেতুর মতোই আমাদের দু'টি বোনের হৃদয়-আকাশে উদয় হয়েছে। দিদি গেছে, এবার আমার পালা!

৩

দীর্ঘদিন পরে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেলেও সে তার অত্যাচারের চিহ্নটা রোগীর দেহ ও মনের ওপর খুব বেশী রকমই রেখে গিয়েছিল। ডাক্তার বল্লে,—বায়ু-পরিবর্ত্তন ছাড়া এর অন্য দ্বিতীয় উপায় নেই। তরল বাবু মাকে অভয় দিলেন। মার ত' সে ছাড়া কথা নেই। আমার ব্যবহারে মা পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আমার যে উপায় ছিল না। সমস্ত বিরক্তি সহ্য করবার জন্য নিজেকে দৃঢ় করে তৈরী করছিলুম।

সন্ধ্যার সময় গল্প করতে করতে তরল বাবু বল্লেন,—মাসী মা, ডাক্তার ত' আপনাকে হাওয়া বদলাতে যেতে বলেছে। জানেন ত' কাশীতে আমাদের একখানা বাড়ী আছে। এখানে আমারও শরীর ভাল থাক্‌ছে না, দু'চার দিনের মধ্যেই আমি কাশী যাব, আপনি যদি ইচ্ছে করেন আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আলো, কি বল?

মনে মনে বল্লুম,—ওগো তোমার দয়ার অত্যাচার থেকে বাঁচাও। প্রকাশ্যে বল্লুম,—মার যা ইচ্ছে।

মা আবেগে বলে উঠ্‌লেন,—আহা, এমন কি পুণ্যি করেছি বাবা, যে বিশ্বনাথ আমার ওপর দয়া করবেন, তবে তোমার কল্যাণে—

কি যে বলেন মাসীমা। যাক্‌, তাহ'লে রাজী ত? আর দু'এক মাস থেকে শরীরটা একটু শুধ্‌রে আসা উচিতও। আলো, তুমি ধীরে ধীরে দু'একদিনের মধ্যে সব গুছিয়ে ফেলতে সুরু কর, মাসীমা ত' এ শরীর নিয়ে কিছু করতে পারবেন না, তোমায়ই ত সব করতে হ'বে।

কী সুন্দর সরলতা-মাখান কথাগুলি! এর থেকে অভিনয় আর কত সুন্দর হ'তে পারে! এর অন্তরের আসল মানুষটির পরিচয় যে পেয়েছে—সেই জানে কত বড় অভিনেতা এই লোকটি। আমারই মুখ দিয়ে

বেরুতে চাইছিল, চমৎকার! কিন্তু একটু একটু করে মাকড়সার জালের কবলে মাছিটির মতোই যে এগিয়ে পড়ছিলুম সেটুকু অভিজ্ঞতা, সেটুকু ভবিষ্যদৃষ্টি আমি পেয়েছিলুম!

তারপর একদিন যখন তরুণ সূর্য্য তার সুন্দর হাসি মুখে, বারাণসীর সর্ব্বোচ্চ মিনারের ওপর প্রথম চুম্বনের স্পর্শ এঁকে আলোকের ঝরণার মতোন আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এমনি এক প্রত্যুষে গঙ্গার পোলের ওপর রেল থেকে, কত না পুরাতন এই পুণ্যপুরীর ওপর প্রকৃতির এই নব রচনা বিস্ময়-ভরা চাহনিতে দেখতে দেখতে যখন ষ্টেশনে এসে নামলুম—বহু কণ্ঠে চারদিক থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লো—কাশী! কাশী!!

৪

কাশীতে তরল বাবুদের বাড়ীখানা গঙ্গার ধারে গৌরাঙ্গ ঘাটের ওপর। এই ঘাটের পথ-চলাচলের রাস্তায় একটি ছোট-খাট বাজার বসে থাকে। বাড়ীখানির চারদিক্ খোলা। ছাত থেকে শুধু গঙ্গাই দেখা যায় না, আরো চোখে পড়ে,—ও-পারে ঘন-শ্যামল তরুশ্রেণীর ওপর দুপুর-বেলার রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরী, সন্ধ্যার রঙীন মেঘের হোরী খেলা, দূরে,—ছবির মতো রামনগরের রাজবাড়ী, আরও দূরে,—বিন্ধ্যগিরির অস্পষ্ট ছায়া, ধোঁয়ার মতো একটা সাদা-কালোয় মেশান রেখা! যে দিকেই চোখ ফেরান

যাক্ না কেন, চোখ তৃপ্তিতে ভ'রে, শুধু ভেসে ওঠে ছবি, ছবি! কী সুন্দর! অবসর পেলেই ছাতের একটি কোণে দাঁড়িয়ে এই সব দেখতুম, অন্তরের আনন্দ উছ্‌লে উছ্‌লে পড়তো! এ আনন্দকে সম্পূর্ণ হরণ ক'রে তরল বাবু যখন তখন ছাতে আসতেন। তার অনুরোধ সত্বেও ছাতে থাকতুম না, নীচে চলে আসতুম।

তরল বাবু আমাদের যত্নে রাখবার কোনই ত্রুটি করেন নি। বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ভাল ঘরখানা আমাদের থাকবার জন্য দেওয়া হ'য়েছিল, চাকর-দাসী আমাদের আদেশের জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে! কিন্তু এই যে উদারতা, কতখানি অনুকম্পার আড়ালে আত্মগোপন করে আছে, সে ত' আমার মনের অগোচর নেই! যাকে খুসী করার অন্তরালে, তরল বাবু কার কৃতজ্ঞতার আশা রাখেন, সে গোপন খবর তার মুখ দিয়ে কখনো না বেরুলেও, দু'একটি প্রশ্নে, "কোন কষ্ট হচ্ছে না ত' আলো?" বিশেষ করে তার সেই সময়কার চোখের দৃষ্টিতে সব কথা খেলে যায়। এততেও এ বিদ্রোহী হৃদয় কৃতজ্ঞ হ'তে পারছিল না। নিতান্ত অসহ্য মনে তার দয়ার নিষ্পেষণ নিরুপায় হয়েই ভোগ কচ্ছিলুম।

কাশীর জল হাওয়ার গুণে মা একটু একটু করে নষ্ট

স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে সেই সময়-টুকুর প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে থাকতুম, যখন বেলাশেষের গান চরাচরের কণ্ঠে বাজতে থাকত। প্রতিদিন এমনই সময় একখানি নৌকো করে আমরা ঘাটের পর ঘাট চলেছি, চলেছিই! কথা বড় একটা কেউই বলতুম না, শুধু দেখতুম। দেখতুম—সমস্ত চোখের গ্রাস দিয়ে। গঙ্গার কূলে কূলে কত বড় বড় প্রাসাদ, দেবালয়, পঞ্চমী তিথির অর্দ্ধচন্দ্রের মত কাশীকে তার অপূর্ব্ব রূপ-শোভায় ভরিয়ে তুলেছিল! সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা ও আরতি যেন এই রূপসী নগরীকে বন্দনা করত! কোন্ রাজবাড়ীর সানায়ের করুণ তান পূরবীর আলাপে যখন এই মহীয়সীকে প্রেম নিবেদন করত, সেই করুণ নিবেদন আমারও অন্তরে সোহাগের ছোঁয়া দিয়ে যেত! তন্ময়তা ভাঙ্গত তখন, নৌকো কিনারায় ভিড়িয়ে মাঝি যখন ডাক দিত!

এমনি কোরে দিনগুলো কাটছিল।

একদিন দুপুর বেলা—বাইরে সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়ার মাতন চলেছে। দু'একটা রৌদ্রতপ্ত চীল মাঝে মাঝে অতি করুণ-স্বরে ডেকে ডেকে উঠছিল। দরজা জানালা বন্ধ করে মেঝেয় একখানা মাদুর বিছিয়ে, তার ওপর আঁচলখানা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছি—মা একমুখ হাসি নিয়ে

ঘরে ঢুকে, বল্লেন,—শুন্‌ছিস মা, তরল আমায় কি বলছিল ? চোখ দুটি ঔৎসুক্য ও শঙ্কায় ভরে নিয়ে মার মুখের ওপর তুলে ধরলুম। মা আমারই কাছটিতে বসে পড়ে, আমার গালের ওপর থেকে সস্নেহে চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে বল্লেন,—তরল তোকে যে বিয়ে করতে চায়—কথা ক'টার মধ্যে দিয়ে মার মনের খুসী উপ্‌চে পড়তে চাচ্ছিল।

কথাটায় খুব বেশী আশ্চর্য্য হই নি—এমনি কিছু একটার অপেক্ষায় ত' বসেই ছিলুম। শ্লেষ করে বল্লুম,—বটে, দিদিকে যেমন বিয়ে করতে চেয়েছিল—

শোন কথা, তোর সঙ্গে তার কথা—

সত্যিই ত, নইলে এই যৌবনপুষ্ট দেহখানা ত দিদিরও ছিল—ছিল না কেবল দেহের এই কটা রংটা! কিন্তু এই মধুপ-বৃত্তি-ধারী লোকটা, নারীর যৌবন নিয়ে খেলা করা, ভালবাসা পণ্যের মতোই বিলিয়ে বেড়ানো যার স্বভাব,—ঘৃণায় সমস্ত মন বিষিয়ে উঠ্‌ল। আঁচলখানা গুটিয়ে একেবারে উঠে বসলুম। বাঙালী ঘরের কুমারী মেয়ের নিজের বিয়ের সম্বন্ধে সনাতন লজ্জা ঠেলে ফেলে স্পষ্ট বল্লুম,—তরল বাবুকে ব'লো, তার সঙ্গে কথা বল্‌তে আমি ঘৃণা বোধ করি, বিয়ে ত দূরের কথা!

মা আমার কথা শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। এও কি একটা কথা—না বিশ্বাসযোগ্য! এই রূপবান্, ধনবান যুবক কোন্ কুমারী মেয়ের না কাম্য! আমার মুখের দিকে মা যে ভাবে চাইলেন, বেশ বুঝলুম—তাঁর মনে হচ্ছিল, কথাটা বোধ হয় তিনি ভুল শুনেছেন, নইলে নিজের বিয়ের কথা, যার স্মরণে লজ্জাবতী লতার মতোই মেয়েরা কুঁচ্‌কে, জড়ো-সড়ো হ'য়ে পড়ে সেই আমি তাঁর মুখের ওপর কি না—

কিন্তু আবার যখন আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লুম,—এ আমার ছেলেমানুষী আব্দার নয় মা, সত্যি মনের ইচ্ছে—তখন মা বোধ হয় চোখে দুনিয়ার অষ্টম আশ্চর্য্য দেখ্‌ছিলেন!

অল্পক্ষণ গম্ভীর থেকে মা বল্লেন,—তোমার মনের ইচ্ছে নিয়ে চল্লে ত' আমার হ'বে না, যতক্ষণ আমি আছি আমার মত নিয়েই তোমায় চলতে হ'বে! তরলের সঙ্গে তোমার বিয়ে—

কথাটার মাঝখানেই তীব্র-স্বরে বল্লুম,—এটা ঠিক জেন মা, যদি আমার মনের বিরুদ্ধে কিছু কর্‌তে চাও তা' হ'লে তোমায় মেয়ের মায়া ছেড়েই তার আয়োজন করতে হ'বে।

মা থম্‌কে গেলেন! আমায় অনুরোধ করলেন,

রাগলেন, কাঁদলেন, বোঝালেন কিন্তু আমায় দৃঢ় মত থেকে টলাতে পারলেন না। শেষে গোঁ হ'য়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেল হ'য়ে আস্ছিল। সেদিন কারোই বেড়াতে যাবার সাড়া দেখা গেল না, আমিও কেমন যেন স্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। এ যেন ভালই হ'ল! মা ও তরল বাবু— এ দু'জনের আড়ালে থাক্‌তেই যেন আমার মন চাইছিল। সমস্ত সন্ধ্যাটা ছাতে বসে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 'বেণীমাধবের ধ্বজা'টি অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল—সেইদিকে চেয়ে কত না কথা ভাবছিলুম!

তারপর থেকেই কেমন যেন সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল। মা ত' আমার সঙ্গে বড় একটা কথাই বলেন না। আমি এতে নিজেকে যেন রেহাই পেয়েছি বলে ভাবতুম। নীরবে আপনার কাজগুলো করে যেতুম।

রাত্রে তরল বাবু খেতে বসেছেন, মা একখানা পাখা নিয়ে অল্প হাওয়া দিতে দিতে বল্লেন,—আর কেন বাবা, এবার আমাদের বিদেয় দাও, অনেক দিনই ত' হ'ল।

তরল বাবু তার অভ্যস্ত হাসিটুকু হেসে বল্লেন,—এত তাড়া কেন মাসীমা, কষ্ট হ'চ্ছে থাক্‌তে বোধ হয়।

মা তাড়াতাড়ি বল্লেন,—এই দেখ পাগলা ছেলে, কষ্ট কি রে? তবে আর কেন—

আমি দালানটার পাশে বসেছিলুম। মার কথার সুর ধীরে ধীরে আমায় ধরে টান্‌বার উপক্রম করছে দেখেই আমি সেখান থেকে সরে গেলুম।

আমার যে কাশী ভাল লাগছিল না, তা নয়, কিন্তু এই অপ্রীতিকর অবস্থাটা অত্যন্তই অসহ্য হয়ে উঠছিল। বিশেষ তরল বাবুকে চোখ থেকে চিরদিনের মতো নির্ব্বাসিত করতে মন যেন বেশী রকমই অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েছিল।

মা গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। আমি ঘর-দোর গুছোচ্ছিলুম, তরল বাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে থতমত খেয়ে গেলুম। সেই বিয়ের কথা নিয়ে মার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হওয়ার পর থেকে তরল বাবুকে আমি বিশেষ করেই এড়িয়ে চলতুম। আজ নিজেই সে আমায় বিয়ে করবার আগ্রহ দেখালে, উচ্ছ্বাসও হয়ত অনেকখানি বেরিয়েছিল কিন্তু আমার মনের খবর সে ত' রাখত না। যে অন্তর্দ্দাহ অনির্ব্বাণ চিতার মতোই বুকের মাঝে জ্বল্‌ছিল, কতখানি ঘৃণা যে তার সম্বন্ধে মনে পুষে রেখেছি—সে কথা কাউকে আমি জান্‌তে দি নি!

আমার স্পষ্ট অসম্মতিতে তরল বাবু এবার অন্য সুরে

বলে যেতে লাগলেন,—কিন্তু আলো, আমি যে তোমায় চাই! এ বিবাহে তোমার মার যখন কোনও আপত্তি নেই, তখন তোমাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে বিশেষ শক্ত হবেনা বোধ হয়!”

এ কথার উত্তরে চুপ করে থাকবার প্রলোভন সম্বরণ করলুম, বেশ তীব্র-স্বরেই উত্তর দিলুম,—সে একদিন ছিল বটে কিন্তু আজ আর নয়!

বাঃ, তোমায় রাগলে ভারী সুন্দর দেখায় তো—রহস্যের সুরে কথাগুলি বলে আমার মুখের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো! তার দৃষ্টিতে লালসা জল্ জল্ করে ভাস্‌ছিল!

তরল বাবু রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কোন উপায় আমায় না দিয়ে! এমন ভাবে তার রহস্যালাপ কতদিন না শুনে এসেছি, কিন্তু আজ যেন কোন মতেই এ নিয়ে তাকে ক্ষমা করতে পারছিলুম না, একটু এগিয়ে এসে জোরের সঙ্গেই বল্লুম,—আমায় বাইরে যেতে হবে, পথ ছাড়ুন।

তরল বাবু আবার সেই কথা তুলে বল্লেন,—আমি কি তোমার এতই অযোগ্য—

সে কথার আলোচনায় প্রয়োজন আমার নেই, কিন্তু—

থামলে কেন, বল—

বলবার ইচ্ছা অবশ্য অনেক কিছু ছিল! মন থেকে এক একবার ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে চাইছিল—আগুনের হল্‌কার মত, কত না জ্বালা! ভাবলুম, জানিয়ে দি, তোমার ছদ্মবেশের আড়ালের লোকটা আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু, তবু—চুপ করেই রইলুম।

একদিন স্পষ্টই মাকে বল্‌লুম,—আমার কাশী আর ভাল লাগছে না, আর তোমারও ত শরীর ভালো হয়েছে, মিছিমিছি আর পড়ে থাকা কেন?

তরল বাবু কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন, মা তাকে ডেকে বল্লেন,—আমাদের বাবা, একটা দিন ঠিক করে দাও, ঘর-দোর সব ফেলে এসেছি, আর অনেক দিন হ'য়েও গেল।

তরল বাবুর সে উচ্ছ্বাস আজ আর দেখলুম না, সহজ সুরেই বল্লেন,—বেশ—

কিন্তু দৈব বলে হয়ত একটা কিছু আছে! হয়ত কেন, আমার কাছে অতি সত্য।

সেদিন সোমবার। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে কাশীতে কেদারনাথের একটা মেলা বসে। এই দিনটি প্রত্যেক হিন্দুরই অতি পবিত্র পর্ব্ব দিন। এই পুণ্য দিনে

উপোস ও সকাল সন্ধ্যায় দু'বেলা গঙ্গাস্নান নাকি মোক্ষ-লাভের দ্বিতীয় উপায়! অক্ষয় স্বর্গবাসের এমন একটি সহজ উপায় হাতের কাছে পেয়ে, মা কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলেন না এবং চারদিন যেতে না যেতে, জ্বর ও কাসিতে সত্ত সত্তই স্বর্গলাভ করলেন!

আমি চারদিক্ অন্ধকার দেখলুম।

৫

মাকে এমনভাবে, এত শীঘ্র হারাবার কল্পনা ত করিনি! শ্মশানে মার শেষ কাজ করে বাড়ী ফিরলুম! কী অকূলে যে পড়েছি, এতক্ষণ পরে সেটা অন্তরে অন্তরে সাড়া দিয়ে ফিরতে লাগল! কত না অসহায়...আপন বলে আঁকড়ে ধরতে,...কই—আর যে ভাবতে পারি না, যতই ভাবতে যাই, ততই যেন নিরাশার কোন্ অতল গুহায় নিজেকে তলিয়ে যেতে দেখি। অন্ধকার, অন্ধকার, আলো নেই, তার ভবিষ্যৎ আগমনের চিহ্নটিও যে আজ কল্পনা করতে সাহস পাচ্ছি না। মার মৃত্যুতে ত' এমন করে

শিউরে উঠ্‌ছি নি, উঠছি নিজের অসহায় অবস্থা ভেবে! চক্ষে আমার জল আস্‌ছে না। কোথায় যাব, কি করব, মানস-চক্ষে ভবিষ্যতের কত না ভয়ঙ্কর চিত্র বুকখানার মধ্যে ভেসে উঠে কেবলই কাঁপুনী আস্‌ছে।

তরলবাবু! কবে এই ধূমকেতু আমার জীবন-আকাশ থেকে মিলিয়ে যাবে! এত তার পূর্ব্বলক্ষণ নয়, এ যে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব আভাস! এখন যে নিতান্তই তার মুঠোর মধ্যে নিজেকে নিষ্পেষিত হতে, ছেড়ে দিতে হবে।

ওগো, জগতে সত্যই কি আমার দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত রাখলে না!

দিদি, দিদি, আমার দিদি! এক ঝলক জ্যোৎস্না মনের সেই অতল অন্ধকার গুহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন আলোর ঝরণা বইয়ে দিতে লাগল। কিন্তু, অনেক দিন হয়ে গেল, কোন খবরই ত রাখি না। শেষ পত্রখানায় তাদের কানপুর ছেড়ে দেবার কথা জেনেছিলুম, সেও তো অনেক দিনের কথা! তবে, তবে—ভগবান,—

চোখের জল ঝর্‌তে লাগল, প্রতি শোণিত-বিন্দুটির মতো!

দু' দিন চলে গেল, কেমন করে, কে জানে! দিনরাত

ঘরের দরজাটি বন্ধ করে মেজেয় আঁচলখানা বিছিয়ে শুয়ে থাক্‌তুম। কাঁদতুম, নিজের মনের আবেগে নয়—। চোখ দু'টির মধ্যে সমস্ত শ্রাবণ বোধ হয় বাসা নিয়েছিল।

মাঝে মাঝে তরল বাবু সহানুভূতি দেখাতে আস্‌তেন, তার সহানুভূতি আমায় আরও পাগল করে দিতে লাগল। চিন্তার দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে এক একবার মনে হ'ত, শেষটায় এই লোকটার বিলাস-সম্ভারের মতোই কি থাক্‌তে হ'বে! বিয়ে ক'র্‌বে! বিশ্বাস করি না, হয়তঃ ঐ রকম একটা কিছু ভাণের প্রয়োজন হ'বে। একটা বিয়ের অভিনয় হ'বে। বিয়ে! কত না বিশ্বাসের,—শুধু বিশ্বাসেই ত পর্য্যবসিত নয়; এই সনাতন পবিত্র বন্ধন, যার প্রতি মন্ত্র-উচ্চারণে স্বামী স্ত্রীর মনের গিঁঠে গিঁঠে বাঁধন দিয়ে যায়! কত না কালের জন্য ঐ দু'টি হৃদয়ের এ অটুট বাঁধন—জন্মান্তরেও জাতিস্মরার মতোই যা সে মনের কোণায় লুকিয়ে রাখে! একদিন যেন বহু-পরিচিতের মতো তারই গলায় মালাটি দিয়ে বলে ওঠে,—ওগো চিনেছ কি? সে যে আমি, সেই আমি! এ লোকটা তার কি জানে? তবে উপায়—

বন্দিনীর মতোই ভাবতে লাগলুম—মুক্তির উপায়!

তরলবাবু ঈজি-চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছিলেন,

খুব শক্ত করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েই বল্লুম,—জামাই বাবুর ঠিকানাটা খোঁজ করে দিন।

'জামাইবাবু!' কতকালের কোন কথা বুঝি মনে হ'য়ে তরল বাবু একটু হাস্‌লেন। কথাটা আবার উচ্চারণ করে বল্লেন,—জামাই বাবু!

বিদ্রূপের এই জ্বালাও সহ্য করে ধীরস্বরে বল্লুম,—হ্যাঁ, জামাইবাবু!

তরল বাবু সেই রকম করেই হেসে বল্লেন,—কেন আলো, এখানে থাকতে—

একটা কি যেন কথা চেপে গেল—কথাটা চেপে গেলেও সেই অপ্রকাশিত কথার ইঙ্গিত তার হু'টি চোখের চাহনিতে ও হাসির মধ্য দিয়ে একেবারে আমার অন্তরে গিয়ে পৌঁছুলো। তার আঘাতের তীব্রতা, মুখের গোটাকতক কথার চেয়ে এমন কি কম! কিন্তু, এখন যে আমার স'য়ে নেবারই পালা।

বল্লুম,—আমার ইচ্ছে তার কাছে যেতে, আর আমারই বা আপনার বলতে, সংসারে কে আছে বলুন—

চোখের জল থামাতে পারলুম না! চোখে কাপড় দিয়ে ফোঁপাতে লাগলুম!

তরল বাবু চেয়ারখানি ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে

একখানি হাত আমার পিঠে দিতে যাবেন কি—অম্‌নি আমি চম্‌কে দু'পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ালুম। তার সহানুভূতির ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে এ কী দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলুম!

সে অবাক্ হয়ে গেল! এতটা বোধ হয় আশা করে নি! তবুও ঘর থেকে চলে গেলুম না, আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে আমাকে। এমন ভাবে আর পারি না।

বল্লুম,—যদি দিদির ঠিকানা খোঁজ করে নাও দিতে পারেন ত, আমায় কলকাতায় রেখে আসুন।

বিস্ময়ে তরল বাবু বল্লেন,—সে কি, সেখানে কে আছে!

নাই থাক্, তবুও আমি যেতে চাই।

পাগল—

দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলুম,—আপনি যদি আমায় না রেখে আসেন, আমি একলাই চলে যাব, কোন কিছুই আমায় বাধা দিতে পারবে না।

কিন্তু আলো, আমার এখানে তুমি কেন সব কর্ত্তৃত্ব নিয়ে থাক না, তুমি ত জানো, তোমার মার এতে কতখানি মত ছিল, আর এতে তোমার স্বর্গগত মা—

কথাটা শেষ হ'বার পূর্ব্বেই বল্লুম,—কবে যাবেন তা হ'লে, একটা দিন ঠিক করে ফেলুন।

সত্যি ব'লছ যাবে?—কিন্তু তুমি বুঝচ না আলো, এখনও ভেবে দেখ—

আমার শেষ কথা আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বল্‌ছি, আমায় দয়া করে রেখে আসুন—

হাত দু'টো জোড় করে ফেল্লুম—সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা করে নয়, আমায় রেহাই দাও, তোমার দয়া থেকে বাঁচাও।

*   *   *   *

কাল চলে যাব। কি হ'বে, কেমন করে চল্‌বে! এক একবার মনে ভয়ের সৃষ্টি করলেও, আজ এখান থেকে চলে যাবার ব্যগ্রতায় অদূর ভবিষ্যতের কোন রূপই আমি ধারণা করে নিতে পারি নি। একটু একটু করে যাবার সময় এগিয়ে আস্‌তে লাগল! অজ্ঞাত-ভয়ে শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌তে লাগল। কী দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিলুম পৃথিবীতে! এই তরুণ জীবনে আপনার বল্‌তে কেউ নেই, তার ওপর অভিশাপের মতোই এ রূপ, যৌবন!

কলকাতার বাড়ীতে এক বুড়ো ঝি—

ভাবলুম জীবনটাকে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দি, তরলকে গিয়ে বলি,—এই নাও আমার জীবনের বোঝাটা, কিন্তু

না, তার চেয়ে সহস্র বিপদ—বরণ করে নেওয়া ভাল নারীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, অথচ সেই মর্য্যাদা কেমন করে বাঁচাব! চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুললুম।

সমস্ত রাত যুদ্ধ করে ভোরের দিক্‌টায় ক্লান্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে যখন জাগলুম, তখন মন আমার লোহার মতোই শক্ত। এ সংসারে নারীর সে দিন কি আস্‌তে পারে না, যেদিন সে পুরুষের সাহায্য না নিয়েও নিজেকে চালিত কর্‌তে পারে? নিজেকে দিয়ে পরীক্ষা করতে হ'বে, এর জন্য সহস্র বাধার মধ্যেও নিজেকে ঠেলে দেব! কিন্তু, কিন্তু,—

এই কিন্তুর সঙ্কোচই এক একবার পিছন থেকে আঁচল ধ'রে টেনে আমাকে যেন বাধা দিতে লাগল!

বেলা তখন দু'টো। গাড়ী করে ষ্টেশনে রওনা হ'লুম। পোলের ওপর থেকে কাশীর দিকে চাইতে গেলুম, পারলুম না। অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্রে শুধু কাশীকেই জ্বলিয়ে তুল্‌ছিল না, চোখকেও ঝল্‌সে দিতে চাইছিল।

দু'হাত তুলে নমস্কার করলুম।

মোগলসরাই জংশনে পৌঁছুলুম। এখান থেকে প্রায় সমস্ত স্থানের যাত্রীকেই গাড়ী বদ্‌লাতে হয়। প্লাট্‌ফরমে কত না রকমের যাত্রী। কেউ ছুট্‌ছে, কেউ কুলীর সঙ্গে ঝগড়া করছে, কেউ খাবার কিনে খাচ্ছে, কেউ পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লী নিয়ে এক জায়গায় বসে আছে, নিশ্চিন্ত মনে! কৌতূহলে এ সব দেখছি। এই সব বিচিত্রতার মাঝে মোহ-মুগ্ধের মতো দাঁড়িয়েছিলুম!

তরল বাবু একটা কুলীকে জিনিষ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় আমাদের সাম্‌নের প্লাট্‌ফরমে দৈত্যের মতো বেগে একখানা প্রকাণ্ড ট্রেণ হুস্‌-হুস্‌ শব্দে এসে পড়লো। শত শত লোক তার ভিতর থেকে নাম্‌তে লাগলো। চঞ্চলতার সাড়া চার্‌দিকে পড়ে গেল! জন-সমুদ্রের কল-কোলাহলের দিকে চোখ দু'টো আপনিই আবদ্ধ হ'য়ে রইলো!

ও কে! জামাইবাবু, দিদি!

বিস্ফারিত চোখে চাইলুম! হৃদয়ের মধ্যে রক্তের মাতন অসহ্য পুলকের তালে তালে নাচ্‌তে লাগল। সত্যি, সত্যি, আমার চোখ আমায় প্রতারিত করে নি।

দিদি,—

সমস্ত অন্তরের আবেগের উৎস কণ্ঠ থেকে ছাপিয়ে

ছড়িয়ে পড়ল ! চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে থেকে তাকিয়ে দেখি—কত না নির্ভরতায় আমার হাত দু'খানা তার গলাটি জড়িয়ে আছে—একান্ত আশ্রিত লতাটির মতোই !

মরণোন্মুখ সূর্য্যের আভা যেন অভিবাদন করতে এসে, তখন দিদির চোখের জলের মধ্যে ঝিকিমিকি খেলছিল।

—:o:—

তরলের কথা

১

আলো—

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি,—কই সে ত আমার পাশে নেই। উদ্বেগ-আকুল চোখ দু'টি চার্‌দিকে ফেলতে লাগলুম। পরক্ষণেই অতি বড় বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম! এই এত বড় ষ্টেশন, সমুদ্রের উর্ম্মির মতো মানুষের মাথাগুলি ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, আসছিল, আর তারই আহত গর্জ্জনের মতোই মানুষের সেই অবিশ্রান্ত কোলাহল। মুহূর্ত্তের জন্য সে-সব ভুলে মনের সমস্ত সত্ত্বা

হারিয়ে ঐ দু'টি কণ্ঠলগ্না নারী-মূর্ত্তিকে ঘিরে, আমার হারাণ চেতনা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। শুধু মুহূর্ত্তের জন্য!

কালো, আর তারই গলায় মালার মতো আলো।

তাদের সাম্‌নে এগিয়ে একটু হেসে বল্লুম,—তা হ'লে কালো আমার দায়িত্বের বোঝা তোমার কাছেই নামিয়ে গেলুম।

কালো কথা বল্লে না, শুধু মাথার কাপড়টা সাম্‌নে আরও টেনে দিলে; কিন্তু প্রতিনিধি স্বরূপ তার অল্পভাষী স্বামিটি রেলের টিকিটখানা আমার হাত থেকে নিয়ে নিজের মনিব্যাগের মধ্যে পুরে বল্লেন—ধন্যবাদ।

ট্রেনখানা নিজেকে ছোটাবার জন্য যতখানি অস্থির হ'য়ে ফুঁস্‌ছিল, দু'টি বোনের মুখ চোখ দিয়ে যেন তার শতগুণ অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল,—ট্রেনখানা ছেড়ে দেবার অপেক্ষায়। কালোর স্বামী দু'হাত তুলে আমায় নমস্কার ক'রে তাদের নিয়ে গাড়ীতে চড়ে বস্‌লেন!

গাড়ী ছাড়ল। আনন্দে হিস্‌ হিস্‌ করতে করতে গাড়ীখানা চল্‌তে লাগ্‌ল, প্রথমটা ধীরে। কিন্তু মনের অধীর আনন্দ চেপে রাখ্‌বার শক্তি তার ছিল না। ছুটল, ছুটল, পাগলা মহিষের মতো, উদ্দাম গতিতে—আমার বুকের পাঁজরা-গুলোয় ধাক্কা দিতে দিতে!

ঐ দিকে চেয়ে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। উপেক্ষিত-পরাজিত-পরিত্যক্ত! কত না যুবতীর চোখের মিনতির ডোর যাকে বাঁধতে পারে নি, সেই চির-বন্ধন হীনের,—জীবনের ওপর পরাজয়ের এ কী ছাপ এঁকে দিয়ে গেল, ওই মেয়েটা! তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিলুম, কিন্তু—

নিষ্ফলতার ক্রোধ সমস্ত শরীরকে যেন অস্বস্তির-দহনে পোড়াতে লাগল।

২

সুন্দর সুপুরুষ বলে আমার বেশ একটু খাতির ছিল, আর সে খাতিরটুকু আদায় হ'ত মেয়ে-মহলের মধ্য থেকেই! আমিও তাদের সঙ্গটা একটু বেশী করেই চাইতুম। মেয়েদের সঙ্গে মিশ্‌তে মিশ্‌তে তাদের মনের অনেক অলি-গলির খোঁজ-খবরও আমি পেয়ে গিয়েছিলুম। শুধু নারীর সৌন্দর্য্যই যে পুরুষকে আলোর শিখায় পতঙ্গের মতো পুড়ে মর্‌তে আহ্বান করে, তা ত' নয়, পুরুষের সৌন্দর্য্যেরও সে দাবী আছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ জীবনে

আমি অনেকবার পেয়েছি ! সেই দাবীর শক্তিতে তাদের পাবার যত না লোভ ছিল, তাদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতুম,—অনেক বেশী।

কালোদের ছোট পরিবারটির সঙ্গে আলাপের প্রথম স্থচনায় তার বিকচ যৌবনের মাধুর্য্যই আমার চোখকে নেশাচ্ছন্ন করেছিল। শুধু সৌন্দর্য্যের দাবীই ত' শেষ নয়, যৌবনেরও দাবী করবার মতোন যথেষ্ট আছে, তাই তার পরিপুষ্ট যৌবনের আকর্ষণ বসন্তের বনশ্রী-তে প্রকৃতির শ্যামল মধুরতার মতো আমায় মুগ্ধ করেছিল। কালোর ঐ নিবিড় যৌবনের আড়াল থেকে রূপের ঐশ্বর্য্যে চোখকে ভরিয়ে তুলেছিল, আলো। কিশোরীর স্নিগ্ধরূপ ও যুবতীর পরিপূর্ণ যৌবনের উগ্র মাদকতা দুই-ই যেন কলি ও কুসুমের মতো একে আর একটির অভাব পূর্ণ করে তুল্‌ছিল। তারই মাঝে নিজেকে অনেকখানি জড়িয়ে ফেলেছিলুম। রূপযৌবন-লোলুপ পুরুষ হৃদয় আমার, এই দুটি মেয়েকেই বুঝি কামনা করেছিল !

এই দু'টি মেয়ের মন জয় করে আন্‌ছিলুম, নানা দিক্ দিয়ে। কিন্তু রূপলুব্ধ মানুষের মনটা সুন্দরেরই উপাসনা করতে চায় বেশী, তাই অনেক সময়ই আমার আকর্ষণটুকু ছদ্ম অন্ধকারের আশ্রয়ে যে আলোকে ঘিরে জেগে

উঠ্‌ছিল, তখনকার মত সকলের কাছে ফাঁকি দিতে পারলেও, একজনের কাছে পারি নি। সে কালো! তার বুকে হিংসার কাল-মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল।

আদিম কাল থেকে পুরুষ নারীর কাছে, আর নারী পুরুষের কাছে,—যে যতটুকু চাওয়া চেয়ে এসেছে, কে তার কতটুকু পেয়েছে! তবুও এক একজন নিজেকে প্রেমাস্পদের কাছে বিলিয়ে দেওয়ার সার্থকতার মাঝে, এটা বুঝে দেখ্‌বার অবসর চায় না,—যে নিজেকে, সে যে এমন করে সম্পূর্ণ নিঃশেষে উজাড় করে দেয়, তার বিনিময়ে সে কিছু পায় কি না! এই না পাওয়াটাই যেন তাদের একটা বড় পাওয়া! কিন্তু এ ভুলও ভাঙ্গে!

তাই একদিন সত্যই যখন নিজেকে বুঝে দেখ্‌বার জন্য কালো বস্‌লো—সে বুঝ্‌তে পারলে। তার মোহ ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তার অনেক আগেই তাকে জয় ক'রে, আমার বিজয়-টিকা তার ললাটে এঁকে রেখেছিলুম।

কালোর বিয়ে হ'য়ে গেল। মুক্তির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার এই জয়লব্ধ প্রাণীটিকে নিয়ে খেলা করে এসেছি। বিজয়ের মূল্যও তার জন্য কম দিতে হয় নি।

কালোর কথা মনের মধ্যে মিলোবার আগেই,

আলোকে পাবার যে অঙ্কুরটুকু অন্তরে লুকান ছিল, আজ সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু এই যে আলো—যাকে কত না সুলভ ভেবে এসেছিলুম এতদিন, একটু একটু করে সে ভুলটা ভেঙ্গে আস্‌ছিল ক্রমেই। তবুও ত' তাকে মুঠোর মধ্যে করবার লোভ দমন কর্‌তে পাচ্ছি না। তার রূপে-মোড়া দেহটাকে নিজের দুর্দ্দমনীয় বাসনার কাছে, একদিন চোরের মতোই টেনে এনেছিলুম, কিন্তু তাতে ত' পাবার আনন্দ পাই নি।

সহজে যে জিনিষটি পাওয়া যায়, তার ওপর ত' আগ্রহ জাগে না, কিন্তু যাকে পাবার মধ্যে কত না বাধা মাথা উঁচিয়ে থাকে, তাকেই লাভ করবার জন্য মানুষের মন উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

সত্যিই তাই। নইলে কি আছে ওই আলোর মধ্যে! অমন কত না তরুণীর চোখের জলের বন্যায়, দীর্ঘ-নিশ্বাসের ঝড়ে, তাদের জীবনের অন্তঃপুরে মহাপ্রলয় হ'য়ে গেছে! কিন্তু এই মেয়েটা নিজের গর্ব্বে আমায় ভ্রূকুটি করে চলে যাবে আর আমায় তা সইতে হ'বে! তাকে জয় করবার জন্য আমার সমস্ত শক্তি খরচ করতে প্রস্তুত হ'লুম। এমন কি নিজে যেচে তার কাছে ধরা দিতে গেলুম, সে প্রত্যাখ্যান করলে। এ ঘটনা আমার কল্পনার বাইরেই

এতদিন ছিল। সেদিন সেটা ভাঙ্গল! বুঝলুম, নারীর মন জগতের এক বিস্ময়ের সামগ্রী! এক অদ্ভুত সৃষ্টি!

তারপর একদিন যখন সে মাকে হারিয়ে পথে দাঁড়াল, জগতে আপন বলে আঁকড়ে ধরতে আর কেউ রইল না, মনে মনে হাসলুম। এবার, এবার যে বিষহীন নাগিনীর মতোই লুটিয়ে পড়তে হবে, এই পায়ে! তোমায় নিয়ে তখন আমি ছিনিমিনি খেলব! কিন্তু একি, ওই অতটুকু মেয়ে, পথের ধূলো মাথায় বরণ করে নিতে প্রস্তুত হ'ল। বাধা দিতে যাবার অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু তার তেজস্বী মনের কাছে আমার সমস্ত শক্তি আহত হ'য়ে ফিরে এল। তার ইচ্ছাতেই সম্মতি দিলুম, ভাবলুম হয়ত বাস্তব দৈন্যের মধ্যে পড়লে, কল্পনার খেয়াল ভুলে যাবে—তখন, তখন—

কিন্তু মৃগী হঠাৎ শিকারীর লক্ষ্য এড়িয়ে কোন্ গহন বনে লুকিয়ে পড়ল।

*　　*　　*

আরে তরল দা' তুমি—কে যেন আমার হাতখানা তার হাতের মধ্যে নিয়ে জোরে নাড়া দিলে। এতদূর তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলুম যে প্রথমটা চমকে উঠলুম।

একটু সামলে নিয়ে বল্লুম,—পূর্ণাঙ্ক যে, ভাল ত' হে?

হ্যাঁ, তা তুমি এখেনে কোথা থেকে।

একটু থতমত খেয়ে বল্লুম,—এই একজনকে তুলে দিতে এসেছিলুম।

ও, তুমি দেখছি ভারী পরোপকারী হ'য়ে পড়েছ।

হ্যাঁরে হতভাগা, তা তুই এখেনে কেন? থাকিস— কোথায় কলকাতার চাঁপাতলা, এসে পৌঁছলি কি না একেবারে মোগলসরাই!

এই ত গাড়ী থেকে নামলুম, মাকে চেঞ্জে নিয়ে যাচ্ছি চুণার! শুনেছি পশ্চিমের অনেক জায়গা থেকে চুণারের জল-হাওয়া নাকি ভাল। কি বল?

শুনেছি এই পর্য্যন্ত, পরীক্ষা করে দেখিনি কখনও। তা তোমার মাকে বুঝি ওয়েটিং রুমে দিয়ে এসেছ, তাঁকে একলা বেশীক্ষণ রেখো না!

মোট কথা পূর্ণাঙ্ককে এড়িয়ে যেতে চাইছিলুম। সমস্ত মন অবসাদে ভরে এসেছিল, একলা থাকতেই ভাল লাগছিল।

পূর্ণাঙ্ক আমায় ছাড়লে না, ধরে বসলে—আমাদের চুণারের গাড়ীতে তুলে দিয়ে তবে যেতে পাবে। এস, মার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি। বলে, পূর্ণাঙ্ক আমায় এক রকম জোরে টেনে নিয়ে চল্ল।

তাঁকে বুঝি লেডিস্ ওয়েটিং রুমে দাও নি, একলা তাঁকে কোন্ আক্কেলে—

ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। তখনকার মতোন সে কক্ষে আর কেউ-ই ছিল না। কেবল দু'খানি চেয়ারে দু'টি নারী মূর্ত্তি আমার চোখে পড়ল। একজন প্রৌঢ়া ও একটি তরুণী।

সম্ভ্রমের সঙ্গে সেদিকে তাকালুম।

পূর্ণাঙ্ক পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল—মা, তরল দা' আমার বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে পড়ে এসেছিলুম অনেক দিন—তোমার কাছে ধরে নিয়ে এলুম, আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে তবে ছাড়ান পাবে। আর তরল দা' এটি আমার ছোট বোন, প্রীতি।

দু'জনকেই হাত তুলে নমস্কার করলুম।

পূর্ণাঙ্কর মা হেসে বল্লেন,—বস বাবা।

মেয়েটি সলজ্জ হাসিতে নমস্কারটি ফিরিয়ে দিলে!

আলাপের মধ্যে থেকে প্রীতির দিকে তাকিয়ে দেখে নিলুম। সহরের আধুনিক মেয়েদের চাল-চলন, সাজ-গোজ কিছুরই অনুকরণ করতে সে ক্রটী করে নি। বেণীটি পিঠের ওপর লুটে পড়েছে। দু'কাণে দু'টি মুক্তোর আঙুর দু'লছে। পরণে একটি সাদা সেমিজের ওপর একখানা খদ্দরের ছাপান চওড়া রঙীন পাড়ের সাড়ী, তারই ফুলকাটা আঁচলখানার একপাশ বুকের ওপর একটা সোণার ব্রুচ

দিয়ে আঁটা। দু'হাতে দু'গাছি সোণার সরু রুলী। গলায় খুব সরু একগাছি হার। পায়ে জরীর কাজ-করা লাল নাগরা।

প্রথম চোখে মেয়েটিকে দেখায় মন্দ নয়। কিন্তু ওই সাজ-সজ্জার ভেতরকার মেয়েটি রূপসী মোটেই নয়। কিন্তু তার দেহটা সুন্দর না হ'লেও, কথাবার্ত্তার মাঝখানে তাকে ভালই লাগ্‌তে লাগ্‌লো।

পূর্ণাঙ্ক বল্লে,—তুমি তরলদা', মা'দের সঙ্গে একটু গল্প কর, আমি ততক্ষণ একটা কাজ সেরে আসি! চুণারের গাড়ী সেই সাড়ে সাতটা।

কথা কটা শেষ করেই সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

আমি তার মার দিকে চেয়ে হেসে বল্লুম,—ওর ছেলেমানুষী এখনও যায় নি, তেমনি তড়বড়ে এখনও।

তিনি স্নেহভরা-কণ্ঠে বল্লেন,—যা বলেছ বাবা, তাই ওকে নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরুতে ভয় হয়।

এরি মধ্যে প্রীতি একটি টিনের বাক্স থেকে চা'য়ের সমস্ত সরঞ্জাম বার করে সাজাতে লাগল। ষ্টোভটি জ্বেলে শূন্য কেৎলীটির দিকে চেয়ে মাকে বল্লে,—তাই ত মা, দাদা ত' চলে গেল, চা যে চড়াব, জল কই?

আমি আলাপটা গাঢ় করবার জন্য বল্লুম,—আমি এনে দিলে, দোষ হ'বে না নিশ্চয়।

প্রীতি একটু যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে মার মুখের দিকে চাইলে। তিনি কিন্তু প্রীতির-স্বরেই বল্লেন,—বেশ তো, আসুক না মা, এও ত আমার এক ছেলে গো।

কেৎলীটি জলে ভরে ফিরতেই প্রীতি বল্লে,—আপনাকে কষ্ট দিলুম।

তা এক পেয়ালা গরম গরম চা দিলেই সব কষ্টের লাঘব হয়ে যাবে।

প্রীতির দিকে চেয়ে দেখি, সে হেসে ফেলেছে!

চায়ের জল ফুট্‌তে ফুট্‌তে আমাদের আলাপের আসরটি এম্‌নি জমে উঠল, যে অপরিচিতের সঙ্কোচ আমরা কেউ-ই অনুভব করতে পারি নি। চা তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্ক ফিরে এল।

আমি ঠাট্টা করে বল্লুম,—কি হে, চায়ের গন্ধ নাকে গেছে বুঝি, খুব ছুটে এসেছ ত'!

সকলেই হেসে ফেল্লে।

পূর্ণাঙ্ক বল্লে,—বেশ আছ বন্ধু, খুব জমিয়ে ফেলেছ ত?

পূর্ণাঙ্কর মাতার দিকে চেয়ে দেখলুম, তিনি সস্নেহ নয়নে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

একটা টিফিন কেরিয়ার থেকে খানকত লুচি, দুটো ভাজি, কিছু মোহনভোগ ও একটি মিষ্টি বের করে একখানি ডিসে সাজিয়ে, এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে আমার কাছে রেখে প্রীতি বল্লে,—আপনার 'কষ্টের লাঘব' করুন।

এই সপ্রতিভ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটা প্রীতির রসে মনটা ভরে উঠ্‌ল। বল্লুম,—এই যে সব লোভ দেখাচ্ছেন, পরে যে আমায় তাড়ান দায় হবে।

বেশ ত বাবা, এই ত তুমি বল্লে কোন কাজকম্ম নেই, চল না আমাদের সঙ্গে চুণারে। কাশী থেকে ত' বেশী দূর নয়, দিন কয়েক থেকেই নয় চলে আসবে!

কথা ক'টা বলে, তিনি সস্নেহে আমার দিকে চাইলেন।

পূর্ণাঙ্কও উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠ্‌ল,—চল না তরল দা', চিরটা কালই ত' ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ, দু'দিন চলই না আমাদের সঙ্গে। আর বিয়েও কর নি যে—

আঃ! দেখছেন মা, আপনার ছেলে কত জ্যাঠা হ'য়ে পড়েছে।

তিনি হাসলেন।

পূর্ণাঙ্ক বলে যেতে লাগল,—কী খেয়াল, বিয়ে করবে না, আজ সিমলে, কাল কলকাতা—এই হচ্ছে আর কি!

এমন পাগলামী কোরোনা বাবা।

আমি হেসে বল্লুম,—শোনেন কেন ওর কথা।

আচ্ছা বেশ, বেশ, আমাদের সঙ্গে এখন চুণারে যাচ্ছ কি না?

আচ্ছা তাই হবে গো।

দেখলুম প্রীতির চক্ষুদু'টি তরল আনন্দে ভরে উঠেছে।

আমার সম্মতি পেয়ে পূর্ণাঙ্ক আনন্দের আতিশয্যে আমার হাতটা জোরে নাড়া দিয়ে, প্রীতির দোলানো বেণীটায় একটা টান দিয়ে বল্লে,—এই আমায় খাবার দিলি নি?

তখনও চুণারের গাড়ী আসতে দেরী না থাক্‌লেও, জানা গেল সেদিন ট্রেণ দু'ঘণ্টা দেরীতে আস্‌বে।

পূর্ণাঙ্কর মা বল্লেন,—তাইত বাবা, এই অন্ধকার রাত্রে, বিভুঁই, বিদেশে জানা নেই শোনা নেই, বাড়ী খুঁজে বার করতে পারলে হয়।

সে ত ভালই, গ্রাণ্ড একটা য়্যাড্‌ভেঞ্চার করা যাবে, কি বল তরল দা'!

মা ধমক্ দিয়ে বল্লেন,—বকিস্ নি।

পূর্ণাঙ্ক গম্ভীর-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে,—মেয়েদের নিয়ে পথ চলা, কী যে ঝক্‌মারি তরল দা'—

না, এদের নিয়ে য়্যাডভেঞ্চারের কল্পনা নেহাৎ আমার ভূল হ'য়ে ছিল।

বলে হতাশভাবে ঘাড়টি নাড়লে!

লোকে আবার প্লাট্‌ফরম ভ'রতে সুরু হ'ল। আবার সেই চঞ্চলতা, সেই কোলাহল। গাড়ী আসবার সময়ও হ'ল।

পূর্ণাঙ্ক চুপ করে থাকবার ছেলে নয়, সে বল্লে,—তরল দা' প্রীতির গান ত' তুমি শোন নি, শুন্‌লে চুণার ছাড়তে চাইবে না।

শোনেন কেন ওর কথা।

ঘাড়টি বাঁকিয়ে প্রীতি দাদার দিকে কৃত্রিম রোষে চাইলে।

আমিও একটু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্লুম,—সত্যি! তা হ'লে ত আপনাদের সঙ্গে যেতে রাজী হ'য়ে ভাল কাজই করেছি।

বাস্তবিক মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চল্‌ছিল, আর তারই ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতে নতুনের সাড়ায় যেন নতুন শক্তি ফিরে এল। এ রকম ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম না হ'লেও, আজ এরই জন্য যেন আমার পরাজিত মনের ওপর থেকে অবসাদের ছায়া সরে যেতে লাগল।

মধুপ

আলো! আলো! জীবনের অনধিত অধ্যায়ের খানকতক নতুন পৃষ্ঠায় সে না হয় কয়েকটা মোটা মোটা রক্তের আঁচড় কেটে দিয়েই চলে গেছে।. দাগ যদি তার নাও মিলিয়ে যায়—ক্ষত যে শুকিয়ে যাবে তাতে আর কোনও ভুল নেই!

৩

রাত্রির অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে, আমরা চুণার পৌঁছলুম। তখন বেশ একটু রাত হ'য়েছিল।

পূর্ণাঙ্কর য়্যাড্‌ভেঞ্চারের কল্পনা সত্য হ'তে সুরু হ'ল। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখলুম, দু'একখানা এক্কারূপ পুষ্পক ছাড়া, দ্বিতীয় অন্য কোন যানই নেই।

পূর্ণাঙ্ক বল্লে,—তরলদা', তুমি নয় এক্কা চড়ার সুখটা ভোগই করেছ, আমাদের ঘাব্‌ড়ে দিচ্ছ কেন। এই এক্কায়ালা, ওরে ভাড়া যায়গা ?

আমি একধারে মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়ে, তার অপূর্ব্ব হিন্দী শুনতে লাগলুম!

এক্কোয়ান ঐটুকু গাড়ীর মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। পূর্ণাঙ্কর ডাকে সে তড়িতানন্দ-সেবিত চোখ দু'টি বিরক্তভাবে তার দিকে তুলে বল্লে,—এক টাকা লাগ্‌বে বাবু।

'আরে হাম্‌লোগ কাঁহা যায়গা, আগে শুনো!

আমি দেখলুম, পূর্ণাঙ্ককে না থামালে আর চলছে না। তাকে সরিয়ে দিয়ে আমি এক্কোয়ানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করলুম। সে আরো দু'খানা এক্কা যোগাড় করে নিয়ে এল। তাকে সহরের মধ্যে নিয়ে যেতে বললুম। যার বাড়ীতে আমরা যাব, এক্কোয়ানদের কেউই তার সন্ধান দিতে পারলে না। ভাবলুম, সহরের মধ্যে গেলে কোন না কোন লোক হয়ত বলে' দিতে পারে।

ছোট সহরটির পাথরে বাঁধান পথের ওপর দিয়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দ করতে করতে, হেল্‌তে দুল্‌তে এক্কা ক'খানা হোচোট্ খেতে খেতে চললো। সহরের মধ্যে এখানে সেখানে দু'একটা দোকান, সব দোকানেই একটা কোরে কেরোসিনের আলো মশালের মতো জ্বল্‌ছে। তাতে আলো যত না হচ্ছে, ধোঁয়া হ'চ্ছে তার অনেক বেশী।

সহরটার চৌরাস্তায় আমাদের এক্কা তিনখানা থাম্‌লো। এবার,—বাস্তবিক সকলের মুখেই ভাবনার সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠ্‌লো।

পূর্ণাঙ্ক বল্লে,—তরলদা' এস কোনো বাঙালীর সন্ধান করে দেখা যাক্, বাঙালী নিশ্চয় বাঙালীর খবর বল্‌তে পারবে।

কথাটা খুবই ঠিক।

আমি বল্লুম,—তুমি এঁদের নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর, আমি খোঁজ নিয়ে আস্‌চি।

কিন্তু যেতে আর হল না, একটি লোককে এদিকে আস্‌তে দেখে বল্লুম,—এই লোকটি বাঙালী, এর কাছে খবর পেলেও পেতে পারি।

পূর্ণাঙ্ক বল্লে,—যাঃ, হাতে ইয়া লাঠী, ইয়া মালকোচা বাঁধা কাপড়, আর চেহারাখানাও—এ যদি তোমার বাঙালী—

কথাটা তার আর শেষ হল না।

লোকটি নিজেই জিজ্ঞেস করলে,—আপনারা যাবেন কোথায়?

পূর্ণাঙ্ক বল্লে,—এখানে রাজেন বাবুর বাংলো কোথায় বলতে পারেন? এক্কাওয়ালারা তো কেউ-ই জানে না দেখছি।

জানে বিলক্ষণ, তবে তিনি তো ও নামে এখানে পরিচিত নন, এখানে উনি রাজাবাবু বলেই বিখ্যাত! কিন্তু আপনারা বড়ই ভুল করে এসেছেন, আর যেতেও হবে অনেকটা।

তারপর তিনি এক্কোয়ানদের কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে, বুঝিয়ে দিয়ে লাঠীখানা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে হন্ হন্ করে চলে গেলেন। আমাদেরও সকলের মুখের ওপর থেকে চিন্তার ছায়া অনেকটা সরে গেল।

পূর্ণাঙ্ক বিষাদের ভাব দেখিয়ে বল্লে,—বাংলা দেশের সুনামটা এরাই ডোবালে দেখছি। কী চোয়াড়ে চেহারা, গলার আওয়াজই বা কী! সব চেয়ে বড় বিস্ময় লোকটার পালোয়ানী চলন। নাঃ, বাঙালীর নাম দেখছি, আর থাকে না।

না হেসে থাক্‌তে পারলুম না।

অন্ধকারের উজ্জ্বলতার মধ্যে যতটুকু চোখে পড়ে, দেখলুম অল্পদূরে গঙ্গা বয়ে চলেছে, আর দু'ধারে ঘন গাছের সারের মধ্যিকার রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি! পূর্ণাঙ্ক তখন একটু চুপ করেছিল। আর বাস্তবিক, কথা বলতে প্রাণ তখন চায় না! গাছগুলি ও তার পাতার ছায়ায় যেন অন্ধকার রাত্রির ওপর আরও

একপোঁচ কালো রং লেপে দেওয়া হয়েছিল! রূপকথার কোন্ রাজপুত্রের মতোন যেন অন্ধকারে কোন্ পাতালের রাস্তা বয়ে চলেছি।

এক্কা ক'খানা একটা ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। রাত তখন বারোটা। ফটক বন্ধ! আমাদের দু'জনের সম্মিলিত কণ্ঠের চীৎকার ও ডাকাত পড়ার মতো ফটকের ওপর নির্ম্মম অত্যাচার—কিন্তু সাড়া যে কেউ দেয় না! পুঁটলী-পোঁট্‌লাগুলো নামিয়ে এক্কোয়ানদের বিদায় করতেও মন সরছিল না।

আমরা পরাস্ত হ'য়ে এ-ওর মুখ চাইচি! কী করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্ক আবার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কি কল্পনা বল্‌তে যাচ্ছিল, মা এমন ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন যে দ্বিতীয় কথাটি তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। বুঝলুম, এই মা-টি নিজের অধিকারটুকু পূরোমাত্রাই বজায় রাখ্‌তে পেরেছেন!

আমরা পরাজিত হ'লেও, এক্কোয়ানরা পরাজিত হ'ল না। তাদের একজনের চীৎকারেই আশ্চর্য্য ফল দিলে।

কৌন হায় রে,—একটা শব্দ ভেতর থেকে এলো, কিন্তু ফটক খুল্‌লো না।

আবার ধাক্কা!

এবার একজন লোক ফটকের ভেতর থেকেই উত্তর দিলে, কেয়া মাঙ্‌তা?

আলিবাবা নাটকে দস্যুদের গুহায় প্রবেশ করবার যে সঙ্কেতটি, ঐ অতবড় পাহাড় দু'খানাকে আপনিই যেমন সরিয়ে দেয়, 'রাজা বাবু' এই অব্যর্থ মন্ত্রে ঠিক তেমনি ভাবে দু'খানি বিরাট দরজা আপনিই যেন দু'পাশে সরে গেল। আমরা প্রবেশ করলুম।

লোকটা সিদ্ধির গোলাপী নেশায়, হয়ত কোন অনির্দ্দিষ্ট প্রিয়ার রঙিন ঠোঁটের স্বপ্ন দেখছিল, এ সময় নিতান্ত অভদ্রের মতো আমাদের আসাটা কিছুতেই তার মনঃপূত হয় নি। নেশায় ঢুলু-ঢুলু আরক্ত চোখ দুটি তুলে' আমাদের দিকে তাকিয়ে হাতের জ্বলন্ত মাটীর ডিব্বাটা নিয়ে এগোতে এগোতে বললে, আইয়ে!

পরের দিন উঠ্‌তে বোধ হয় একটু দেরী হয়েছিল। বাড়ীখানি চোখে ভারী ভাল লাগতে লাগল। চারিদিকেই সাজান বাগান। গাছে গাছে ফুলগুলো যেন রূপের মেলা বসিয়ে দিয়েছে! চুণারের দুর্গ থেকে গঙ্গার

ধার দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে, তারই পাশে পাশে বাংলোর ধরণে বড়লোকদের কয়েকটি স্বাস্থ্যনিবাস তৈরী হয়েছিল। মালিকরা বড় কেউ একটা থাকতেন না। আসতেনও ক্কচিৎ কখনো। কিন্তু লোকের অভাব কখনো বাড়ীগুলোতে হত না। বাড়ীর মালিকের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের মেলা, বার মাসে তের পার্ব্বণের মতোই লেগে থাকত।

আমাদের ঘরখানার পাশ দিয়ে ছাতে যাবার সিঁড়ি, ছাতে উঠে সমস্ত সহরটা, এমন কি দূরে মির্জ্জাপুর সহর ও আকাশের নীল কাপড়ে সবুজ পাড়ের মতোন বিন্ধ্যগিরি দেখা যায়।

সেদিন রোদটা লাগছিল ভাল। নেমে বাগানের মধ্যে ঢুকতেই দেখি প্রীতি এক রাশ ফুল নিয়ে একটা পাথরের বেদীতে বসে আর পূর্ণাঙ্কও রয়েছে তার কাছে।

ওঃ, তোমরা অনেকক্ষণ উঠেছ বোধ হয়?

পূর্ণাঙ্কর মুখ ছুটল।—না, তোমার মতোন বেলা আটটা অবধি পড়ে পড়ে নাক ডাকাই আর কি? উঠতে যদি ভোরে, দেখতে উষার সে কি পবিত্র মূর্ত্তি! তার পলকের আগমন ভঙ্গিমার সে কি ব্রীড়াবনত কুণ্ঠিত ভাব, তার আঁচলের বাতাসে কত না সৌরভ! আস্‌তে না

আস্‌তে এত শীঘ্র বিদায় নিতে হবে ব'লে তার যে কান্না ঐ দেখ গাছের পাতায় পাতায় সবুজ ঘাসের ওপর তারই ঝরা অশ্রুকণা এখনও শুকোয় নি। . সূর্য্যের রক্ত আঁখি দেখেই বেচারী পালিয়ে গেছে!

পূর্ণাঙ্ক গম্ভীরভাবে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

সর্ব্বনাশ, তোমার কবিতা লেখার বাই আছে নিশ্চয়।

প্রীতি হেসে বল্লে, ঠিক ধরেছেন, দু' দু'খানা খাতা কবিতায় ভরা! কিন্তু দাদার কবিতা ত আপনি শোনেন নি, সত্যি বেশ লেখে!

দাদার গৌরবে তার কণ্ঠ যেন উচ্ছ্বাসে ভরে উঠ্‌লো।

ওঃ, পূর্ণাঙ্ক তা হলে ভক্তও একটি তৈরী করে তুলেছো। কিন্তু ভাই আমার মতোন অ-কবি কি তোমাদের আসরে জায়গা পাবে? হেসে ফেল্লুম।

বোকো না, চলো একটু চায়ের যোগাড় দেখা যাক।

৪

বসন্তের হাওয়ার মতো দিনগুলো কাটছিল।

পূর্ণাঙ্ক এরই মধ্যে অনেকগুলি কবিতা লিখে আমাদের শুনিয়েছে। প্রীতির গান ত রোজই শুনতুম। এর মধ্যে আমরা একদিন চুণার দুর্গ দেখে এলুম। দুর্গটিকে দেখতে দেখতে মোগল-পাঠানের অনেক কাহিনীই স্মরণ হতে লাগল। কত মানুষের রক্তস্রোত এখানে নদীর মতোই বয়ে গেছে। কত প্রিয়হারা তরুণীর উষ্ণ-নিশ্বাসে, বিগলিত অশ্রুতে কত শত বিষাদ-কাহিনী উপকথার মতো রচনা হ'য়ে রয়েছে!

আর আজ !

দুষ্ট ছেলেদের জন্য সেটা সংশোধন-স্কুল হয়েছে ! আর তাদেরই দিয়ে কাজ করাবার জন্য মোগল তরুণীদের বিলাস কক্ষগুলিতে নানা রকম কলকারখানার আমদানী হয়েছে।

কয়েক মূহূর্ত্তের জন্য দার্শনিক হয়ে পড়লুম। মনের মধ্যে অনেকগুলি 'হায় হায়' জাগান্ দিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। চূণারের মত ছোট জায়গায় দেখবার আর কি থাকতে পারে! আমরা রোজই প্রায় সন্ধ্যের সময় গাছের মধ্যেকার রাস্তাটি দিয়ে বেড়াতুম। মা সব দিন সঙ্গে থাকতেন না। রাস্তাটির পাশেই বালির চড়া! দু' একদিন গঙ্গার ধারে বালির চড়ার ওপরেও আমরা বসে থাকৃতুম।

প্রীতিকে যতই দেখছি, ততই তাকে ভাল লাগছে। এই মেয়েটির মধ্যে একটা বিশেষত্ব বেশ বড় করেই আমার চোখে পড়েছিল, যা আমায় প্রতি-মূহূর্ত্তের জন্য তার কাছে টেনে নিচ্ছিল। রূপের একটা সাধারণ আকর্ষণ কার না আছে? বিশেষ আমার মধ্যে এ দুর্ব্বলতাটুকু ত বেশী করেই আছে, এ স্বীকার করবার লজ্জা আমার নেই। যৌবনের প্রাপ্য দাবীও অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রীতির রূপের নেশা আমার ধরে নি,

কারণ, আগেই বলেছি সে রূপসী নয়। যৌবনের মোহ? কিছু সত্য! কিন্তু এ-সবের কথা আমি বলছি না। আমি যা বলছিলুম, সেটা মানুষের সঙ্গে তার মেশবার ক্ষমতা। বিশেষ—আলাপের সঙ্কোচহীন ভাবটুকু বাঙালীর ঘরের যত বড় শিক্ষিতাই হোন না কেন, তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এর সত্যি অভাব। তাঁরা শিক্ষিতা হ'লেও, তাঁরা যে মেয়ে, পুরুষ তাঁদের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ, সে সংস্কারটুকু থেকে ত মুক্ত হ'তে পারেন নি, আর চানও না বোধ হয়। নইলে বিচার শক্তির অভাব মেয়েদের মধ্যে আছে, এত বড় মিথ্যা কথা আমি বলতে চাই না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পুরুষের কাছে তারা ইচ্ছে করেই নত হ'য়ে পড়েন।

প্রীতির বিশেষত্ব এইখানে, এই কথাই আমি বলছিলুম। সেদিন এমনি একটা কথার প্রসঙ্গে সে বললে, মেয়ে পুরুষের পার্থক্য কোথাও নেই, তরলবাবু। আছে শুধু মনে। এই মনকে যেদিন আমাদের মেয়ে জাতটা, নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে আন্‌তে পারবে, সেদিন পুরুষ ও নারীর সমস্যা আপনিই চুকে যাবে। নারীর জাগরণের জন্য পুরুষের প্রাণ কেঁদে ওঠ্‌বার কোন প্রয়োজন হ'বে না। বক্তৃতা, প্রবন্ধ কিছুরই দরকার নেই।

অন্ততঃ আমি নিজের মনের দিক্ দিয়ে মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমি ত আপনার আমার মধ্যে মানুষ হিসেবে কোন পার্থক্যই খুঁজে পাই না।

তার কথাগুলি শুনতুম। কথাগুলির বাদ-প্রতিবাদ, এমন কি সত্যাসত্যের দিক্ পর্য্যন্ত আমি ভাবতুম না। আমি ভাবতুম, অনেক মেয়েই মনের মধ্যে কত না মত গড়ে তোলে, কিন্তু অবাক্ হয়ে যেতুম, এই যে বাংলাদেশের এই মেয়েটি জোর গলায় যে কথা বলবার সাহস রাখে, দেশে ক'জন মেয়ের এ সাহস আছে!

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রীতি ও আমি গঙ্গার ধারের বালির চড়াটার ওপর বসে রয়েছি। প্রীতি ছেলেমানুষের মত বালিগুলো নিয়ে খেলছিল। মা বাড়ীতে ছিলেন, পূর্ণাঙ্ক সহরে গিয়েছিল।

প্রীতি এক আঁজলা বালি তুলে নিয়ে, ধীরে ধীরে আঙুলের ফাঁক দিয়ে সেগুলো ফেলতে ফেলতে বল্লে,—আচ্ছা তরলবাবু, এই যে প্রেমে পড়া বলে—অবশ্য দু'দিক

থেকে তাগিদ না এলে প্রেমে পড়া হ'তে পারে না,—এমন কোন কথা নিশ্চয় নেই। কিন্তু বলতে পারেন প্রথম তাগিদ আসে কার দিক্ দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে সে নিজেই আবার বল্‌তে লাগ্‌লো,—পুরুষের দিক দিয়ে, নয় কি? তার যদি মেয়েটিকে ভাল লাগ্‌লো, তিনি দয়া করে তার প্রেমে পড়লেন। আর মেয়েদের জয় করে নেবার কত না কৌশল পুরুষের মনের তূণে জমান র'য়েছে! অবশ্য সব ক্ষেত্রের কথা আমি বলছি না।

মনের মধ্যে আলোর কথা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরে গেল।

প্রীতি বলে যেতে লাগলো,—কিন্তু ধরুন একটি কুৎসিত মেয়ে। কিন্তু সে ভালবেসে ফেলেছে একটি সুন্দর তরুণ যুবাকে। তার প্রধান অন্তরায়—তার রূপ। সে ত তাকে পাবার সাহস করতেই পারবে না, নিজের কদাকার চেহারাটার জন্যে! নিজেকে হীন মনে করে দল্‌বে দু'পায়! কিন্তু এই পুরুষই যদি কুৎসিত হয়, তার মন তো নারীর মতো নীচ হয়ে ভাবতেই পারে না। সে সন্ধান করে বেড়ায় ঐ সুন্দরী তরুণীকে লাভ করবার চেষ্টায়! এ কেন? মনের পার্থক্যই কি এর কারণ নয়?

আমি এতক্ষণে বল্লুম, তা হলে ত তুমি স্বীকার করছ, পুরুষ নারীর চেয়ে বড় !

প্রীতি একমুঠো বালি মুঠোর মধ্যে ধরে চেপে রাখবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বল্লে, সে ত আগেই বলেছি, মেয়েরা মনের মধ্যে পুরুষদের যে বড় আসন দিয়েই রেখেছে !

আকাশ থেকে অন্ধকার নেমে আসছিল !

চলুন তরলবাবু, ওঠা যাক্।

এস !

বাড়ী ফিরতে ফিরতে প্রীতির কথা ভাবছিলুম—কী বলতে চায় এ মেয়েটা ? এই ভূমিকার প্রয়োজনই বা কি !

৫

দিনের পর দিন রহস্য-জালের মতো প্রীতি আমায় ঘিরে ফেল্‌ছিল।

সেদিনের সেই ভূমিকার কতখানি প্রয়োজন ছিল, একটু একটু করে সেটা ফুট্‌তে সুরু করেছে।

কোন দিন বা সে বলেই বসে, তোমায় আমি ভালবাসি, তোমায় আমি চাই! বিয়ে! সে ত ফুলের শেকল। চির-চঞ্চল মন ত তাতে বাঁধা পড়তে পারে না। আর

বিয়ে যদি করতেই হয়, তা এই সাজানো মেয়েটাকে—ছোঃ! একে পাবার আমার দিক্ দিয়ে তো কোনো তাগিদ নেই, কিন্তু প্রীতির প্রতি কাজে, কথায়, হাবে, ভাবে, অনবরত তাগিদের যে ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, সে তো আমার মনকে ফাঁকি দিয়ে লুকোতে পাচ্ছে না। এক একদিন ভাবি, চলে যাই কিন্তু পারছিও না যে! মেয়েদের মধ্যেও অনেকে পুরুষকে খেলনার পুতুলের মতোন নিয়ে খেলা করে—বিশেষ যদি সে কোন উপায়ে জানতে পারে যে খেলবার যন্ত্রটি তার অধীন।

কিন্তু আমি তো কই সে স্বযোগ—না, দিয়েছি বই কি! তন্ময় হ'য়ে তার গান শুনতুম, মুগ্ধনয়নে তার দিকে চেয়ে থাকতুম; প্রশংসার কলোচ্ছ্বাসে সমস্ত কণ্ঠ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্ত। সব চেয়ে বেশী,—যাই যাই ক'রে আজ কতদিন তো হ'য়ে গেল। এ সবই যে আমার বিপক্ষে, তার অনুকূলে।

সত্যি, আমার ভয় হচ্ছে প্রীতিকে। আমি মনে করে উঠতে পারছি না, যে আমি প্রীতির মুঠোর মধ্যে, কি সে আমার। সেইটে জেনে নিতেই হবে।

তখনো পূর্ণাঙ্ক ঘরে বসে আপন মনে কবিতা লিখছিল। সন্ধ্যার পাতলা আঁচলখানি উড়ে উড়ে দিনের গায়ে

রহস্যের স্পর্শের মত এসে লাগছিল। বাগানটার চারদিকে আমি আর প্রীতি ঘুরছিলুম! দু'একটা ফুল ছিঁড়ে ছড়াচ্ছি, বা চুপ চাপ বেড়াচ্ছি।

প্রীতিকে বল্লুম, এস বসা যাক্। একটি বটগাছ, তারই তলায় একখানা লোহার বেঞ্চ।

দু'জনে বসলুম।

প্রীতি, সেই গানখানা, একবার গাও না।

কোন্‌খানা, বলুন ত!

প্রীতি যেন গানখানা স্মরণ করে আনবার চেষ্টায় মনকে কোন্ দূর দেশে পাঠিয়ে দিলে।

নিজের ওপর বিরক্ত হ'লুম। এই সবেই ত মেয়েটা আমায় পেয়ে বসেছে।

বল্লুম—জানি না!

আচ্ছা বলুন ত' তরলবাবু, স্বর, তান, লয়, এই সব মিলিয়ে যে ওস্তাদী গান, তা আপনার ভাল লাগে, না, গানের মধ্যে কথা ও ভাবে ভরা সুরের যে হিল্লোল-টুকু ব'য়ে যায়, সেই আপনাকে আনন্দ দেয়?

কোন উত্তর দিলুম না।

বলুন না, বলবেন না ত? আচ্ছা বেশ!

প্রীতি কৃত্রিম গম্ভীর হ'য়ে নিজের হাতের সঙ্গেই পাঞ্জার কসরৎ সুরু করলে। কিন্তু চুপ করে থাকবার মেয়ে তো সে নয়, একটু পরে বল্লে,—জানলে তো বলবেন, কিন্তু এটা ঠিক কি না, তাদের যদি কেবল ঐ তান লয় মানের দিকেই লক্ষ্য থাকবে, তা হ'লে ভাবকে বরণ করে আনবার সময় পাবে কখন? আর ভাব রূপ ধরে না আস্‌লে, যতই গলার শিরা ফুলে উঠুক না কেন, সে গান প্রাণশূন্য! নয় কি?

আঃ দু' ভাই বোনই দেখছি গুরু মশায়! একটি কবিতায়, অন্যটি গানে! এবার আর চুপ করে থাকলুম না, বল্লুম, এইমাত্র তো নিজেই তুমি আমার অজ্ঞতা প্রমাণ করলে আবার—

কথাটা শেষ করবারও উপায় নাই, মাঝখানেই প্রীতি বলে উঠলো, ওঃ তরলবাবুর শরীর থেকে একটু রাগের স্ফুলিঙ্গও যে ফুটছে, আচ্ছা একখানা গান শুনবেন বই ত নয়!

এই জ্যাঠামিতে বিরক্তির ঝাঁজ খুব বেশী করেই শরীরকে ঝল্‌সে দিতে লাগল! সব সহ্য করা যায় কিন্তু মেয়েদের জ্যাঠামি একেবারেই অসহ্য! বিশেষ, সে যদি আবার একটু লেখাপড়া জানা হয়!

প্রীতি ততক্ষণে গাইছিল—

ওগো, দখিন-হাওয়া !
ও পথিক্ হাওয়া !
দোদুল-দোলায় দাও দুলিয়ে,
দখিন-হাওয়া !
নূতন পাতার পুলক ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে,
দখিন-হাওয়া !
আমি, পথের ধারের ব্যাকুল বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু গো—আহা
এস, আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে
দখিন-হাওয়া
ওগো, দখিন-হাওয়া, পথিক হাওয়া—
পথের ধারে আমার বাসা—
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা
দখিন-হাওয়া !
আমায় তোমার ছোঁয়া লাগলে পরে
এক টুকুতেই কাঁপন ধরে গো, আহা
কানে, কানে একটি কথায়, সকল কথা দেয় ভুলিয়ে
দখিন-হাওয়া !

যেটুকু বিরক্তির ঝাজ মনের মধ্যে জমা হয়েছিল, সুরের হাওয়ায় তার সমস্ত টুকুন উপে গেল। তখনো সুরের নেশা সমস্ত মগজের মধ্যে বাসা নিয়ে ঘুরছিল।

প্রীতির মুখের দিকে চাইলুম!

চাঁদ উঠেছিল আকাশে, কিন্তু তার মহিমা ফুটে উঠেছিল পৃথিবীর বুকে।

আজ প্রীতিকে খুবই ভাল লাগল। মনে হ'তে লাগল প্রীতির হৃদয়ের কথাগুলো সাজিয়ে সাজিয়েই কবি এই গানখানি যেন এত প্রিয় করে রচনা করেছেন। তাই আজ সে মনের সমস্ত ভাণ্ডার নিঃশেষে খালি করে দিয়ে গেল কবিরই কথা দিয়ে।

কিন্তু আমার এ গান এত ভাল লাগে কেন? এই গানের মধ্য দিয়েই আমায় একজন উপাসনা করে, একি তারই আনন্দ?

দু'জনেই উঠলুম! একটি কথাও বল্লুম না! বারান্দায় পূর্ণাঙ্ক তখনো কবিতা লিখছিল, প্রীতি দাদার পাশে গিয়ে বসলো।

আমি আমার ঘরে চলে গেলুম। মনে খালি জাগ্‌তে লাগল, আজই তো এই মেয়েটাকে দস্যুর মতো লুণ্ঠন করবার সুযোগ আমার ছিল, কিন্তু,—

সকালে চা পান করবার সময় মাকে বল্লুম,—আমায় কাল মা কলকাতায় যেতে হচ্ছে। একটু কাজ রয়েছে।

কাজ রয়েছে না তোমার মাথা রয়েছে।

পূর্ণাঙ্ক ধমক দিয়ে উঠ্‌লো!

না ভাই, সত্যি। আমায় বাধা দিয়ো না।

আমার কথার ভঙ্গীতে পূর্ণাঙ্ক বেশ একটু দমে গেল, বেশ মিনতির সুরেই বল্লে,—থাকো না ভাই, গোটাকতক দিন আরো! তুমি চলে গেলে ভাই, আমার এখানে মন একটুও টিক্‌বে না। মার দিকে তাকিয়ে সে বল্লে, দেখ্‌চ ত' মা! তরলদা'র চঞ্চল মনকে আট্‌কে রাখা আমার কাজ নয়, দেখ চেষ্টা করে, তুমি যদি পার।

মাও অনুরোধ করে বললেন, বাবা, যদি পার, থেকে যাও আরো ক'টা দিন।

মন তখন রাশ-ছাড়া ঘোড়ার মতো উধাও হ'য়ে কোন্ দিকে ছুট্‌ছিল। আর মনের ইচ্ছাকে রোধ কখনো করিনি, অভ্যস্ত নই।

বল্লুম, কিন্তু মা, ক্ষমা আমায় করতেই হ'বে। তবে যত শীগিগ্‌র হয় আবার নয় আস্‌ব! আর আপনারা তো এখন মাস দু'য়েক থাকবেনও।

তুমি চলে গেলে বাবা,—কিন্তু বাধা দেবার শক্তির অধিকার তো আমাদের নেই।

দেখলুম সত্যিই পূর্ণাঙ্কর মার স্নেহ-কাতর হৃদয় খানি দরদে ভরে উঠেছে।

পূর্ণাঙ্ক আমার সঙ্গে কথা না বলে ঘর থেকে চলে গেল।

প্রীতির মুখের দিকে চাইবার সাহস আমার হ'য়নি।

রাত্রের ট্রেণে চলে যাব।

সমস্ত দিনটা তন্ময়তার স্বপ্নে কেটেছে, সকলেরই। মা আমার প্রিয় খাবারগুলি তৈরী করছিলেন। এ ক'দিনেই তিনি জেনে নিয়েছেন, কি খেতে ভালবাসি, কি না! পূর্ণাঙ্ক সহরে একখানা এক্কার বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিল।

আমার ঘরখানায় বসে একটা ব্যাগে জিনিষ পত্র-গুলি সাজিয়ে রাখ্‌ছি, প্রীতি এসে আমার বিছানার ওপর বস্‌লো! আমিও কাজ ফেলে তার কাছে এসে বসলুম।

আজ প্রীতির কথার ঝরণা যেন শুকিয়ে গেছে। এই নিস্তব্ধতার পীড়ন নিতান্তই অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল।

আর কোন্ কথার সূত্র ধরেই বা তার সঙ্গে আলাপ সুরু করা যেতে পারে। চুপ করে থাকাও শোভন নয়।

বল্লুম, সত্যি প্রীতি এ ক'দিন তোমাদের কাছে থেকে এত স্নেহে জড়িয়ে পড়েছি, যে সে বাঁধন ছিঁড়ে যেতে আমারও লাগ্‌ছে।

বিদ্রুপের ভঙ্গীতে প্রীতি বল্লে, সত্যি নাকি, বোধ হয় নয়, নইলে—

তাইত, এ-রকম অপ্রীতিকর কথা পাড়া ত ভাল হয় নি।

কথার গতিটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টায় বল্লুম, কেন প্রীতি, আবার ত ফিরে আসব।

হ্যাঁ, আপনি ত? সে যা আস্‌বেন—!

হেসে বল্লুম, ওঃ তুমি আমায় চিনে ফেলেছ দেখ্‌ছি।

যাক্, আপনার কাছে এ ক'দিনে অনেক কিছু অপরাধ করেছি, সেগুলো যেন ক্ষমা করে যাবেন।

সামনেই একখানা বই পড়েছিল, কথাগুলি বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রীতি বইখানা টেনে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে সুরু করে দিলে।

এ কি অভিমান!

প্রীতির দিকে চাইলুম। মুখে তো কিছুই ধরা দিতে

চাইলে না। কথা-কটার মধ্য দিয়ে আমার কানে ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হ'লেও, সত্যি তাই না কি!

মনের মধ্যে বিপ্লব বেঁধে গেল। কোথায় আমি চলে যাব, হয়ত কখনো এর নয়ন পথের পথিক হ'ব না, কিন্তু এই প্রীতি, তার আর আমার মধ্যে কোন্ সমস্যা জেগে উঠ্‌তে চেয়েছিল? তার সমাধান কি অপ্রত্যাশিত ভবিষ্যতের অন্তরালে চিরদুর্লভ হ'য়েই থাক্‌বে? এ সিদ্ধান্ত কখনো ভাব্‌তে পর্য্যন্ত পারব না,—সে আমায় জয় করেছে, না আমি! আজ মনের দ্বন্দ্ব চুকিয়ে ফেল্‌তেই হ'বে আমাকে!

কিন্তু—বুক কেঁপে উঠ্‌ছে, কেন?

নিজের হাতখানা দু'একবার এগিয়ে দিতে গেলুম প্রীতির দিকে। তবুও সম্পূর্ণ সাহস করে উঠ্‌তে তো পার্‌ছি না!

সমস্ত শরীরের ওপর অপৌরুষ মনের পীড়ন চল্‌ছিল। এমন ত কখনো হয়নি! তবুও আজ আমায় যাচাই করে নিতেই হবে। এ সুযোগ আর আস্‌বে না! এখন থেকেই কি পরাজয় মেনে চলতে হবে! আলো—না, না,—দু'হাতে নিজের মাথার চুলগুলো একবার সজোরে মুঠো ক'রে ধ'রে ছেড়ে দিলুম! বুকের মধ্যে

অস্থিরতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে দাবিয়ে রাখা অনেক দিনের একটা দুর্দ্দমনীয় প্রচণ্ড লোভের আক্রমণে নিজেকে সংযত করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে অকস্মাৎ সজোরে প্রীতির দেহখানা নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরলুম শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে! উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে প্রীতির মুখের দিকে চাইলুম। আমার কঠিন বাহু-বেষ্টনে তার মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির পাশে কষ্টের রেখা সুস্পষ্ট ফুটে উঠ্‌লেও নিজেকে মুক্ত করে নেবার কোন চেষ্টাই তার দেখা গেল না।

জয়! তবে ত জয়!

জয়ের প্রচণ্ড উল্লাসে সমস্ত অন্তরটার মধ্যে মাত্‌লামো সুরু হ'য়ে গেল! উন্মত্তের মতো আমি প্রীতির দুটি কম্পিত কোমল অধরপুটে আমার তপ্ত ওষ্ঠাধর চেপে ধরবামাত্র দরজার কাছে কার ছায়া দেখে চম্‌কে উঠলুম!

মর্ম্মর-প্রতিমার মতোন দাঁড়িয়ে প্রীতির মা!

মুখে তাঁর সে কী বিস্ময় ও আশঙ্কা!

তড়িৎ-স্পর্শে যেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝঞ্চনা বয়ে গেল!

তখনও তেমনি আমারই বুকের মধ্যে প্রীতি

তেমনি হাতখানা তার গলায় জড়ান!

প্রীতি আমার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে বল্লে,—মা, এতে ওঁর কোন দোষ নেই, আমি ওঁকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছি!

কিন্তু—প্রীতির মা গম্ভীর কণ্ঠে কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, মার কথায় বাধা দিয়ে প্রীতি বল্লে,—না, মা, তরলবাবু যে আমায় বিবাহ করতে রাজী হ'য়েছেন।

আমার চোখের সামনে এ কী অভিনয় হচ্ছে!

বিবাহ!

কই, আমি ত বলি নি!

কিন্তু তা অস্বীকার করবার ক্ষমতাও যে এই মেয়েটি লোপ করে দিয়েছে আমার!

কী চমৎকার ধরেছে আমায়!—আমারই নিজের হাতে সযত্নে রচা ফাঁদে! বাঃ!

অসাধারণ শক্তি এই মেয়েটার!

তাই আমারই বিজয়োৎসবের মুহূর্ত্তে সে আমায় জয় করে নিলে!

—:•:—